ISSN 2519-6030

উত্তরা ইউনিভার্সিটি

লেখনী

ভাষা,সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক জার্নাল

Lekhani : A Journal of Language, Literature and Culture

প্রথম সংখ্যা, মাঘ ১৪২৩
Volume 1, January 2017

Uttara University

CamScanner

লেখনী

ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক জার্নাল

LEKHANI : A Journal of Language, Literature and Culture

প্রথম সংখ্যা, মাঘ ১৪২৩ Volume 1, January 2017

সম্পাদক ইয়াসমীন আরা লেখা

Editor Eaysmin Ara Lekha

বাংলা বিভাগ, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ

Department of Bangla, Uttara University, Bangladesh

CamScanner

লেখনী

ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক জার্নাল
LEKHANI : A Journal of Language, Literature and Culture

প্রথম সংখ্যা, মাঘ ১৪২৩ Volume 1, January 2017

সম্পাদক ইয়াসমীন আরা লেখা
Editor Eaysmin Ara Lekha

প্রকাশক
বাংলা বিভাগ, উত্তরা ইউনিভার্সিটি
ভাটুলিয়া, তুরাগ, ঢাকা-১২৩০, বাংলাদেশ।
ফোন: + ৮৮০-২-৫৮৯৫১১১৬, ৫৮৯৫৫৭৯৪, (এক্সটেনশন ১৩৫, ১০৩)
Lekhani : A Journal of Language, Literature and Culture is published by the Department of Bangla, Uttara University, Bhatulia, Turag, Dhaka-1230, Bangladesh.
Phone : 880-2-58951116, 58955794 (Extension : 135, 103)
E-mail : lekhani@uttarauniversity.edu.bd
মুদ্রণ
আনিকা ইন্টারন্যাশনাল
১৬, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
মূল্য
২০০ টাকা US $ 5

কপিরাইট

লেখনী ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক উত্তরা ইউনিভার্সিটির বাংলা বিভাগের একটি গবেষণামূলক জার্নাল। এর পুনর্মুদ্রণ, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পুনর্মার্জনের জন্য প্রকাশকের লিখিত অনুমোদন অত্যাবশ্যক। এ জার্নালে প্রকাশিত লেখার মতামত, তত্ত্ব ও তথ্যের দায়িত্ব একান্তই লেখকের।

©Lekhani : A Journal of Language, Literature and Culture is an academic journal of the Department of Bangla, Uttara University, Dhaka, Bangladesh. Written permission of the publisher is required where any reprint, changes, edition or any evaluation of the intended reproduction of this journal . Only the authors themsellves are responsible for any opinions or views contained in the articles.

ISSN : 2519-6030

CamScanner

উপদেষ্টা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা
অধ্যাপক ড. এম. আজিজুর রহমান, উপাচার্য, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ

উপদেষ্টা মণ্ডলী
ড. আনিসুজ্জামান, এমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী, এমেরিটাস অধ্যাপক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত
অধ্যাপক মমতাজ বেগম, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ
ড. উদয় কুমার চক্রবর্তী, অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত
ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
ড. সফিকুন্নবী সামাদী, অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
ড. খালেদ হোসাইন, অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
ড. বেলা দাস, অধ্যাপক, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক
অধ্যাপক ড. ইয়াসমীন আরা লেখা, উপ-উপাচার্য, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ

নির্বাহী সম্পাদক
ড. নূর মোহাম্মদ মল্লিক, সহযোগী অধ্যাপক, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ

সদস্য
ড. মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত
ড. চঞ্চল কুমার বোস, অধ্যাপক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
ড. শোয়াইব জিবরান, অধ্যাপক, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
ড. মিল্টন বিশ্বাস, অধ্যাপক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
ড. অতনু শাশমল, সহযোগী অধ্যাপক, বিশ্ব-ভারতী, ভারত
ড. নারায়ণ হালদার, সহযোগী অধ্যাপক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত
মাহমুদা বেগম, সহযোগী অধ্যাপক, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ
শামস্ আল্‌দীন, বাংলা বিভাগ, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ

CamScanner

ADVISORY PANEL

Chief Adviser
Professor Dr. M. Azizur Rahman, Vice Chancellor, Uttara University, Bangladesh

Advisory Board
Dr. Anisuzzaman, Professor Emeritus, University of Dhaka, Bangladesh
Dr. Barun Kumar Chakrabarty, Professor Emeritus, Rabindra Bharati University, India
Professor Mumtaz Begum, Uttara University, Bangladesh
Dr. Uday Kumar Chakraborty, Professor, Jadavpur University, India
Dr. Biswajit Ghosh, Professor, University of Dhaka, Bangladesh
Dr. Shafiqunnabee Samadi, Professor, Rajshahi University, Bangladesh
Dr. Khaled Hossain, Professor, Jahangirnagar University, Bangladesh
Dr. Bela Das, Professor, Assam University, India

EDITORIAL BOARD

Editor
Professor Dr. Eaysmin Ara Lekha, Pro-Vice Chancellor, Uttara University, Bangladesh

Executive Editor
Dr. Noor Mohammad Mallik, Associate Professor, Uttara University, Bangladesh

Member
Dr. Munmun Gangopadhaya, Professor, Rabindra Bharati University, India
Dr. Chanchal Kumar Bose, Professor, Jagannath University, Bangladesh
Dr. Shoaib Gibran, Professor, Bangladesh Open University, Bangladesh
Dr. Milton Biswas, Professor, Jagannath University, Bangladesh
Dr. Atanu Sasmal, Associate Professor, Visva-Bharati, India
Dr. Narayan Halder, Associate Professor, Rabindra Bharati University, India
Mahmuda Begum, Associate Professor, Uttara University, Bangladesh
Shams Aldin, Department of Bangla, Uttara University, Bangladesh

CamScanner

সম্পাদকীয়

বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনে উত্তরা ইউনিভার্সিটির বাংলা বিভাগ থেকে 'লেখনী : ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক জার্নাল' নামে একটি জার্নাল প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। জার্নালটি প্রকাশে অনেকের সহযোগিতা পেয়েছি। প্রধান উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছেন উত্তরা ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম. আজিজুর রহমান। এ ছাড়া অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ ও অধ্যাপক ড. রফিকউল্লাহ খান এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. খালেদ হোসাইন ও অধ্যাপক ড. এ এস এম আবু দায়েনের কাছ থেকে। তাঁদের প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

ভাষা ও সংস্কৃতির বিবর্তন এবং বাঙালির চিন্তনের অভিঘাতকে ধরে রাখার নিমিত্তে এই প্রয়াস। লেখার গুণগত মান ও বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করে নবীন-প্রবীণ গবেষকদের রচনাকে আমরা প্রকাশ করতে উৎসাহী। মৌলিক গবেষণামূলক যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ আমাদের কাম্য।

গবেষণা-সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণের ব্যাপারে কোনো সৃজনশীল জার্নালের যে বিশেষ ভূমিকা থাকা বাঞ্ছনীয় সে বিষয়েও আমরা অত্যন্ত মনোযোগী। আমাদের প্রত্যয় ভবিষ্যতে 'লেখনী : ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক জার্নাল'কে আমরা সমৃদ্ধতর করে পাঠকের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হবো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে ২০১৬ সালের ৫-৬ আগস্ট এ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। যৌথভাবে এটি আয়োজন করে উত্তরা ইউনিভার্সিটি ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ এবং ভারতের রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রচর্চা কেন্দ্র। সম্মেলনে বাংলাদেশ, ভারত, চীন ও জাপানের নবীন-ভাবুক, পণ্ডিত-গবেষকগণ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। জার্নালের জন্যে বাছাই করা প্রবন্ধগুলো সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে। প্রবন্ধগুলোর রিভিউর দায়িত্ব পালন করেন দেশ-বিদেশের বাংলার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, প্রবীণ অধ্যাপক এবং গবেষকবৃন্দ।

বর্তমান জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলোতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা-ভাবনা বাংলাদেশের সার্বিক শিক্ষা-ভাবনার সমান্তরাল এবং একইসঙ্গে প্রাসঙ্গিক। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ গবেষক *নিবেদিতা বিশ্বাস* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নারীভাবনার ওপর আলোকপাত করেছেন। জীবনদর্শন ও শিক্ষাচিন্তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন *শিপ্রা সরকার*। বাংলাদেশের নাজুক শিক্ষাব্যবস্থার অসারতার চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তোতা-কাহিনী'র দ্বারস্থ হয়েছেন *হিমেল বরকত*। শিক্ষা ও সমাজের পারস্পরিক নির্ভরতা বস্তুনিষ্ঠভাবে ফুটে উঠেছে ইয়াসমীন আরা লেখার অনুসন্ধানে। *বাকী বিল্লাহ বিকুল* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা-ভাবনাসংক্রান্ত ত্রয়ী প্রবন্ধে মনোনিবেশ করেছেন। সমাজ ও সভ্যতার অগ্রযাত্রায় রবীন্দ্র-দৃষ্টিভঙ্গিতে নারীশিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন *খায়রুন নিসা*। শিক্ষাসমস্যা নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন *তাছনিম আক্তার*।

CamScanner

এদেশের প্রচলিত শিক্ষাধারার বাইরে শেকড়সন্ধানী শিক্ষা-প্রবর্তনায় শান্তিনিকেতনের ভূমিকা তুলে ধরেছেন *দুলালী রানী সাহা*। রবীন্দ্রমননে শিক্ষার আন্তর্জাতিকতা তথা বিশ্বপল্লির রূপরেখা প্রণয়ন করেছেন *মোঃ ফোরকান আলী* তাঁর প্রবন্ধে।

প্রতিদিন যে সকল নতুন চিন্তক-ভাবুক ও গবেষকের আবির্ভাব ঘটছে তাঁদের রচনা যথাযথভাবে পাঠকের কাছে উপস্থাপন করা আমাদের প্রধানতম দায়িত্ব। আমরা আশাবাদ ব্যক্ত করি– 'লেখনী : ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক জার্নাল' সে দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবে। একটি সৃজনশীল গবেষণাপত্রিকা কোনো দেশের গবেষণার মানোন্নয়নে যে বড় অবদান রাখতে পারে, সে বিষয়ে আমরা সর্বদাই সচেতন।

ইয়াসমীন আরা লেখা

CamScanner

সূচিপত্র

নিবেদিতা বিশ্বাস
নারীশিক্ষাভাবনা ও রবীন্দ্রনাথ

শিপ্রা সরকার
রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ও শিক্ষাচিন্তার স্বরূপ

হিমেল বরকত
রবীন্দ্রনাথের 'তোতা-কাহিনী' ও বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা

ইয়াসমীন আরা লেখা
রবীন্দ্র ভাবনায় শিক্ষা ও সমাজ

বাকী বিল্লাহ্ বিকুল
রবীন্দ্রনাথের ত্রয়ী প্রবন্ধে শিক্ষাভাবনা

খায়রুন নিসা
স্ত্রীশিক্ষা : রবীন্দ্র-দৃষ্টিভঙ্গি

তাছনিম আক্তার
শিক্ষাসমস্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ : একটি পর্যালোচনা

Dulali Rani Saha
Santiniketan Versus Conventional and Didactic Schooling

Md. Forkan Ali
Idea of Global Village and Rabindranath : Tagore's Internationalization of Education

CamScanner

নিবেদিতা বিশ্বাস*

নারীশিক্ষাভাবনা ও রবীন্দ্রনাথ

সারসংক্ষেপ: *রবীন্দ্র-সৃষ্টি সাহিত্যে মূলত জীবনের জলছবি প্রতিফলিত হয়েছে। সেই অংশের বৃহদাকার জায়গা জুড়ে নারী জীবন ও নারীশিক্ষা প্রাধান্য পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নারীশিক্ষা সম্পর্কে মনে প্রাণে মুক্ত ও আধুনিক চিন্তার পরিপোষক ছিলেন। নারীশিক্ষা তথা নারী স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিতে রবীন্দ্রনাথের পরিবারের মতো বর্ধিষ্ণু জমিদার পরিবারকেও যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। নারীর মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্য যেমন তিনি বিশুদ্ধ শিক্ষার কথা বলেছিলেন, তেমন মেয়েদের নারী হয়ে ওঠার জন্য ব্যবহারিক শিক্ষার কথাও বলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন মেয়েরা শুধু আক্ষরিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়ে, আন্তরিকভাবে শিক্ষিত হয়ে উঠুক। তার জন্য সবসময় যে বিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে এমনও নয়। 'নারীশিক্ষাভাবনা ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধে তাঁর মনোজাগতিক নানা প্রেক্ষাপটের দ্বার উন্মোচনের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।*

'মানুষের সৃষ্টিতে নারী পুরাতনী। নরসমাজে নারীশক্তিকে বলা যেতে পারে আদ্যাশক্তি। এই সেই শক্তি যা জীবলোকে প্রাণকে বহন কর, প্রাণকে পোষণ করে। ...প্রকৃতি তাকে যে হৃদয়সম্পদ দিয়েছেন নিত্যকৌতূহলপ্রবণ বুদ্ধির হাতে তাকে নূতন নূতন অধ্যবসায়ে পরখ করতে দেওয়া হয় নি। নারী পুরাতনী'[১]

সৃষ্টিতে নারীকে যতই 'পুরাতনী' বলা হোক, বা বলা হোক 'আদ্যাশক্তি', নারীর স্বাধীনতা এবং শিক্ষা সম্পর্কে তথাকথিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজ, মূল সমাজ-সংস্কৃতি থেকে বা সভ্যতার মূল স্রোত থেকে নারীকে জ্ঞাতে হোক বা অজ্ঞাতে হোক বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছে। অন্তত ইতিহাস আমাদের সেভাবেই ভাবতে শেখায়।

'নারী পুরাতনী' একথা বলার মধ্যে যেমন নারীর গৌরব নিহিত রয়েছে, তেমনি অন্যদিকে তার সামাজিক অবস্থানকে সংকুচিতও করে দেখা হয়েছে। নারীকে আদ্যশক্তি বলা হলেও সব সময়ে তা মানা হয় নি। পুরুষতন্ত্র নিজে বুঝেছে এবং জগৎ-সংসারকে বোঝাতে চেয়েছে যে, সন্তান জন্মদান এবং তার প্রতিপালনের মধ্যেই নারীর প্রকৃত সার্থকতা। সমাজ ও জগতের সঙ্গে বোঝাপড়ায় নারীর বিশেষ ভূমিকা নেই বা তার প্রয়োজনও নেই। এখানে নারীর উর্বরতা শক্তিকেই স্বীকার করা হয়েছে, তার শিক্ষা-সংস্কৃতি বা অন্যান্য সম্ভাবনাকে সেই অর্থে গুরুত্বই দেওয়া হয় নি। অথচ প্রাচীন ভারতীয় সমাজের দিকে তাকালে দেখা যাবে খনা, লীলাবতী, গার্গী, মৈত্রেয়ী, অপালার মতো বিদুষী নারীরা নারীকুল তথা মানবসমাজের গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন।

*পিএইচ.ডি. গবেষক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ভারত

CamScanner

কিন্তু এর পাশাপাশি একথাও সত্যি যে প্রেমে-মমতায়, স্নেহে-ভালোবাসায়, ধৈর্যে-সহনশীলতায় নারী মানবসংসারকে বেঁধে রেখেছে চিরকাল। নারীহৃদয়ের রসমাধুর্যে পরিপূর্ণ হয়েছে পৃথিবী। চর্যাপদের 'অপণা মাংসে হরিণা বৈরী'-র মতো নারীর এই সকল স্বভাবগুণের জন্যই সে পুরুষের হাতে বন্দী হয়েছে, সংসারের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়েছে চিরকাল। 'ছেলেবেলা' (১৯৪০) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন সমাজে নারীর অবস্থানের কথা সরস ও সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন–

> 'মেয়েদের বাইরে যাওয়া-আসা ছিল দরজাবন্ধ পালকির হাঁপ-ধরনো অন্ধকারে, গাড়ি চলতে ছিল ভারি লজ্জা। রোদবৃষ্টিতে মাথায় ছাতা উঠত না। কোনো মেয়ের গায়ে সেমিজ পায়ে জুতো দেখলে বলত মেমসাহেবি; তার মানে লজ্জাশরমের মাথা খাওয়া। কোনো মেয়ে যদি হঠাৎ পড়ত পরপুরুষের সামনে, ফস্ করে তার ঘোমটা নামত নাকের ডগা পেরিয়ে, জিভ কেটে চট্ করে দাঁড়াত সে পিঠ ফিরিয়ে। ঘরে যেমন তাদের দরজা বন্ধ, তেমনি বাইরে বেরবার পালকিতেও; বড়োমানুষের ঝি-বউদের পালকির উপরে আরো একটা ঢাকা চাপা থাকত মোটা ঘটাটোপের। দেখতে হত যেন চলতি গোরস্থান'।[২]

নারীর এই পর্দানসীন জীবনের যেমন অজস্র ও নিখুঁত ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ, তেমনি নারীকে এই অচলাবস্থা থেকে তিনি দেখতেও চেয়েছেন। নারী-শিক্ষার বহু প্রতিকূলতার কথা জেনেও লীলা মিত্রের নারী-শিক্ষাভাবনার সঙ্গে সহমত পোষণ করে 'শিক্ষা' গ্রন্থের অন্তর্গত 'স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন–

> 'যাহা-কিছু জানিবার যোগ্য তাহাই বিদ্যা, তাহা পুরুষকেও জানিতে হইবে, মেয়েকেও জানিতে হইবে–শুধু কাজে খাটাইবার জন্য যে তাহা নয়, জানিবার জন্যই।'[৩]

অর্থাৎ শিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষার কথা মেনে নিয়েছেন। কিন্তু পাশাপাশি এর সীমাবদ্ধতার কথাও বলেছেন–

> 'শিক্ষাপ্রণালীতে মেয়ে পুরুষ কোথাও কোনো ভেদ থাকিবে না, এ কথা বলিলে বিধাতাকে অমান্য করা হয়। বিদ্যার দুটো বিভাগ আছে। একটা বিশুদ্ধ জ্ঞানের, একটা ব্যবহারের। যেখানে বিশুদ্ধ জ্ঞান সেখানে মেয়ে-পুরুষের পার্থক্য নাই, কিন্তু যেখানে ব্যবহার সেখানে পার্থক্য আছেই, মেয়েদের মানুষ হইতে শিখাইবার জন্য যে ব্যবহারিক শিক্ষা তার একটা বিশেষত্ব আছে, একথা বিশেষত্ব আছে, একথা মানিতে দোষ কী?'[৪]

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, নারীশিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা খানিকটা হলেও রক্ষণশীল। এক্ষেত্রে হয়তো তাঁর চিন্তা-ভাবনায় কিছুটা হলেও সীমাবদ্ধতা ছিল। কিন্তু নারীদের মানুষ হয়ে ওঠার জন্য শুধু পুথিগত শিক্ষাকে যথেষ্ট বলে মানেন নি তিনি। এক্ষেত্রে তাদের ব্যবহারিক শিক্ষাদানের কথাও বলেছেন। যা একজন মেয়েকে পরিপূর্ণ নারী হয়ে উঠতে সাহায্য করে। পাশাপাশি একথাও বলেছেন, শিক্ষা মনুষ্যত্ব লাভের উপায় এবং তার অর্জন প্রত্যেক মানুষের সহজাত অধিকার। তাই নারীরও সে অধিকার সহজাত একথা বলাই বাহুল্য আর মেয়েদের স্বভাবে আত্মসমর্পণের যে আদর্শই থাকুক না কেন, তা দাসত্ব নয়। 'স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন– 'আসল কথা এই, স্ত্রী হওয়া, মা হওয়া, মেয়েদের স্বভাব; দাসী হওয়া নয়।'[৫]

শিক্ষা নারীর স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করে–এমন রক্ষণশীল ভাবনা পোষণ করেন নি রবীন্দ্রনাথ। তাই 'স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধেই তিনি বলেছেন–

CamScanner

> 'আমার ধারণা এই যে, মেয়েরা যদি বা কান্ট-হেগেল্‌ও পড়ে তবু শিশুদের স্নেহ করিবে এবং পুরুষদের নিতান্ত দূর-ছাই করিবে না।'[৬]

রক্ষণশীল সমাজের জাঁতাকলে পড়ে মেয়েরা দীর্ঘকাল বন্দী জীবন কাটিয়েছে। দৈহিক ও মানসিক শক্তি এবং 'বিশুদ্ধ শিক্ষা'-র অভাব তার ব্যক্তিত্বের বিকাশে বাধা দিয়েছে পদে পদে।

স্ত্রী ও মা হওয়াই নারী জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়। মনুষ্যত্বের বিকাশেই তার প্রকৃত পরিচয়। আর তার জন্য প্রয়োজন শিক্ষা, নারী তা একসময় নিজেই উপলব্ধি করেছে।

> 'আমাদের দেশে...কৃত্রিম বন্ধনমুক্ত মেয়েরা যখন আপন পূর্ণ মনুষ্যত্বের মহিমা লাভ করবে তখন পুরুষও পাবে আপন পূর্ণতা।'[৭]

আসলে শিক্ষা, যাতে মানুষের বুদ্ধির বিকাশ ঘটে তা শুধু বই পড়ে হতে পারে না। কাজের মধ্যে দিয়েও মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটে। বহিঃপ্রকৃতিতে যে কোনো প্রতিকূল অবস্থায় পড়লে, সংগ্রাম করতে করতে মানুষ শেখে। জীবনে চলার পথে এইরকম আঘাতে আঘাতে মানুষ পরিণত, পরিপূর্ণ ও শিক্ষিত হয়। আর মেয়েদের প্রকৃতিই এমন যে বহিঃপ্রকৃতির চেয়ে অন্তঃপুরের কাজই তাদের বেশি। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রমাবাইয়ের বক্তৃতা উপলক্ষে পত্র'-এ বলেছেন–

> 'মেয়েরা হাজার পড়াশুনো করুক, এই কার্যক্ষেত্রে কখনোই পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে নাবতে পারবে না। তার একটা কারণ শারীরিক দুর্বলতা। আর একটা কারণ অবস্থার প্রভেদ। যতদিন মানবজাতি থাকবে কিংবা তার থাকবার সম্ভাবনা থাকবে, ততদিন স্ত্রীলোকদের সন্তান গর্ভে ধারণ এবং সন্তান পালন করতেই হবে। এ কাজটা এমন কাজ যে, এতে অনেকদিন ও অনেকক্ষণ গৃহে রুদ্ধ থাকতে হয়, নিতান্ত বলসাধ্য কাজ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।'[৮]

–এখানে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্যের কারণটিকে যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক প্রতিবন্ধকতার কথা উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক ভাবনা বা তাঁর রক্ষণশীল মনোভাবের কোনো ছাপ ফুটে ওঠে নি। বরং তাঁর যুক্তিবাদী মনের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ নারীকে একদিকে প্রকৃতি যেমন বন্দী করেছে, অন্যদিকে পুরুষ তাকে বন্দী করেছে। 'প্রকৃতির কাছ থেকে তারা পেয়েছে অশিক্ষিত পটুত্ব';[৯] তেমনি 'মেয়েদের হৃদয়মাধুর্য ও সেবানৈপুণ্যকে পুরুষ সুদীর্ঘকাল আপন ব্যক্তিগত অধিকারের মধ্যে কড়া পাহারায় বেড়া দিয়ে রেখেছে।'[১০] কিন্তু যুগ বিবর্তনের ফলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এ অবস্থার পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়েছে। একটা সময় মেয়েরা সংসারের গণ্ডি অতিক্রম করতে শিখেছে। দীর্ঘকাল এই বন্দীজীবন কাটাবার পর এসেছে সীমানা ভাঙার যুগ। রবীন্দ্রনাথের মতে–'...সেই ঢাকা পালকির যুগ বহু দূরে চলে গেছে। মৃদুপদে যায়নি, দ্রুত পদেই গেছে।'[১১] নারীর শিক্ষা, স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-ভাবনারও বিবর্তন ঘটেছে দ্রুতগতিতে। তাঁর কোনো রচনায়, তাঁর বক্তব্যের মধ্যে স্ববিরোধ বা দ্বন্দ্বময় মনোভঙ্গি এলেও তা চূড়ান্ত নয়। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তা খানিকটা সত্য মনে হলেও রবীন্দ্রনাথ নারীশিক্ষা সম্পর্কে মনে প্রাণে মুক্ত ও আধুনিক চিন্তার পরিপোষক ছিলেন। তাই যুগ বদলের সঙ্গে সঙ্গে নারীর শিক্ষাভাবনায় এই পরিবর্তন তাঁরই পরিবারে কীভাবে শুরু হয়েছিল এবং তৎকালীন সমাজে তা কী প্রভাব ফেলেছিল, তাঁর 'কালান্তর' গ্রন্থের 'নারী' প্রবন্ধে তা ব্যাখ্যা করেছেন–

CamScanner

'বেথুন স্কুলে যে মেয়েরা সব-প্রথমে ভর্তি হয়েছিলেন তা মধ্যে অগ্রণী ছিলেন আমার বড়দিদি। তিনি দ্বার-খোলা পাল্কিতে ইস্কুলে যেতেন, সেদিনকার সম্ভ্রান্তবংশের আদর্শকে সেটা অল্প পীড়া দেয় নি।'[১২]

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অনুশাসন বা সম্ভ্রান্তবংশের নীতি-আদর্শকে, একপ্রকার লঙ্ঘন করে এভাবে নারীশিক্ষা তথা নারী স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিতে রবীন্দ্রনাথের পরিবারের মতো বর্ধিষ্ণু জমিদার পরিবারকেও যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। কিন্তু এ পরিবর্তন ছিল অনিবার্য। মেয়েদের আত্মরক্ষা এবং আত্মসম্মানের জন্য একটা সময়, বিদ্যাচর্চা ও বুদ্ধির চর্চার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আবশ্যক হয়ে উঠেছে নারীশিক্ষা। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন–

'নিরক্ষরতার লজ্জা আজ ভদ্র মেয়েদের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো লজ্জা, পূর্বকালে মেয়েদের ছাতা জুতো ব্যবহারে যে লজ্জা ছিল এ তার চেয়ে বেশি; বাটনা-বাটা কোটনা-কোটা সম্বন্ধে অনৈপুণ্যের অখ্যাতি তার কাছে কিছুই নয়।'[১৩]

মেয়েরা যত শিক্ষিত হয়েছে, তাদের ওপরে চাপিয়ে দেওয়া হাজারো কুসংস্কারকে যুক্তি দিতে বিচার করতে শিখেছে, ততই তারা 'ঘরের সমাজ' ছেড়ে 'বিশ্বসমাজে' উত্তীর্ণ হয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে মানবসভ্যতার ব্যবস্থা-শাসনভার ছিল পুরুষের হাতে। তাই সে তার মতো করে গড়েছিল সমাজকে। নারীশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নারীরও স্বাধীন মত প্রকাশের জায়গা তৈরি হয়েছে। বহুদিনের যে সংস্কারের জালে নারীর হৃদয় আবদ্ধ ছিল তা থেকে হয়ত পুরোপুরি মুক্তি পায় নি, তার মধ্যে প্রথমে খানিকটা ছেদ পড়েছে এবং কালে কালে একটু একটু করে এই বন্ধনজাল ছিন্ন হয়েছে।

নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ নিজেও কতটা আধুনিক মনস্ক ছিলেন তার পরিচয় মেলে রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্র'-এ। 'চিঠিপত্র'-এর ত্রয়োদশ খণ্ডে সুবোধচন্দ্র মজুমদারকে লেখা একাধিক পত্রে পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শমীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পড়াশোনা সম্পর্কে যেমন উদ্বিগ্ন ও সতর্ক দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়, কনিষ্ঠা কন্যা মীরার লেখাপড়া সম্পর্কে সেই উদ্বেগ বা সচেতনতায় কোনো পার্থক্য চোখে পড়ে না। তাই চিঠিতে কখনো লেখেন–'শমী মীরার পড়া কেমন চল্‌চে?'[১৪] আবার কখনো–'আমি মীরাকে এক ঘণ্টা ইংরেজি পড়াইবার জন্য মনোরঞ্জনবাবুকে লিখিয়া দিয়াছি।'[১৫] একজন যথার্থ পিতা হিসেবে পুত্র-কন্যার শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাবনার বৈষম্য ছিল না রবীন্দ্রনাথের মনে। তবে এ প্রসঙ্গে একটা বিষয় অবশ্যই উল্লেখযোগ্য যে, নারীর মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্য যেমন তিনি বিশুদ্ধ শিক্ষার কথা বলেছিলেন, তেমন মেয়েদের নারী হয়ে ওঠার জন্য ব্যবহারিক শিক্ষার কথাও বলেছিলেন। অভিভাবক বা পিতা রবীন্দ্রনাথ কন্যা মীরার ক্ষেত্রে এই ব্যবহারিক শিক্ষার কথা কিন্তু বিস্মৃত হন নি। তাই সুবোধচন্দ্র মজুমদারকে মীরার পড়াশোনার খোঁজ নেওয়ার পাশাপাশি তাকে ঘরকন্নার কাজ শেখাতে নির্দেশ দিয়েছেন–

'বৌঠাকরুণকে বলে দিয়ো মীরাকে তিনি যেন তার ঘনকরনার সঙ্গিনী করে রাখেন–চাই কি ওকে দিয়ে তিনি তাঁর হিসেব রাখাতে পারেন। এ ছাড়া মিষ্টান্ন তৈরির ব্যাপারে যদি তাকে সহকারীরূপে দীক্ষিত করে রাখেন তবে ভবিষ্যতে আমাদের অনেক কাজে লাগবে এবং তোমাদেরও মধ্যে মধ্যে গুরুদক্ষিণা মিলতে পারে।'[১৬]

CamScanner

–কারণ রবীন্দ্রনাথ একথা নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, সমাজের নানা বিষয়ে পরিবর্তন ঘটবার ফলে একটা সময় আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদেরও অবস্থা পরিবর্তন আবশ্যক এবং অবশ্যাম্ভাবী হয়ে পড়বে। তাই অন্তঃপুর এবং বহির্বিশ্ব কোনো একটিকে বাদ দিয়ে নারী সম্পূর্ণা হয়ে উঠতে পারে না। তাকে উভয়ক্ষেত্রেই হয়ে উঠতে হবে সমান পারদর্শী। 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে' রবীন্দ্রনাথ স্ত্রী স্বাধীনতার বিরোধীদের সমালোচনা করেই বলেছেন-

> 'স্ত্রীগণকে অন্তঃপুরে রাখা পুরুষদের সার্থপরতার ফল নয়, সাংসারিক কাজকর্মের অনুরোধে তা স্বভাবতই হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্ত্রী স্বাধীনতা-বিরোধীদের এই এক অতি পুরোনো যুক্তি আছে; কিন্তু আমার বোধ হয় এটা আর কারও চক্ষে আঙুল দিয়ে দেখাতে হবে না যে, প্রাচীরবদ্ধ অন্তঃপুরের মধ্যে চিরকালের জন্যে প্রবেশ করা ও সমস্ত পৃথিবীর থেকে আপনাকে রুদ্ধ করে রাখা স্বাভাবিক হওয়াই নিতান্ত-অস্বাভাবিক।'[১৭]

একমাত্র নারীর শিক্ষার দ্বারাই অন্তঃপুরের এই পর্দার আড়াল সরিয়ে ফেলা সম্ভব।

আসলে বন্ধনমুক্তির এই আকুতি নারীর নিজের মধ্যে জাগ্রত হওয়াটা খুব জরুরি। এ প্রসঙ্গে 'স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধে শ্রীমতী লীলা মিত্রের চিঠির একটি কথা ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক : 'অতএব, গরজ যাহাদের তাঁহাদিগকেই কার্যক্ষেত্রে নামিতে হইবে।'[১৮] রবীন্দ্রনাথও তাঁর এই ভাবনার প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন, যা রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীশিক্ষার প্রতি পক্ষপাতহীন সমর্থন ও তাঁর শিক্ষা ভাবনারই পরিচয় দেয়। রবীন্দ্রসাহিত্যে তাই বারবার শিক্ষিত ও ব্যক্তিত্বময়ী নারীর আবির্ভাব ঘটেছে। 'গোরা'-র সুচরিতা, ললিতা, 'চোখের বালি'র বিনোদিনী, 'শেষের কবিতা'-র লাবণ্য, 'ল্যাবরেটরি'-র সোহিণী–এরা প্রত্যেকেই শিক্ষায়, রুচিতে, ব্যক্তিত্বে স্বতন্ত্র, আধুনিক। তাঁর 'চিরকুমার সভা' (১৩০৭) নাটকের নৃপবালা, নীরবালা, শৈলবালা, নির্মলা–এরা সকলেই রুচিশীলা, সুশিক্ষিতা। পুরবালা ও তার মা জগত্তারিণী এদের তুলনায় একটু সেকেলে হলেও শিক্ষার বিরোধী নয়। তাই পুরবালা তার স্বামী অক্ষয়কে বলেছে– '...মা...তোমারই কথা শুনে...বেশি বয়স পর্যন্ত মেয়েদের লেখাপড়া শেখাচ্ছেন।'[১৯]

এছাড়া এই নাটকের শৈলবালা চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের ব্যতিক্রমী সৃষ্টি। যে তার অকালবৈধব্যকে যুক্তির সঙ্গে মেনে নিয়েছে। হাহাকার করে নি বা সমাজের কাছে মাথা নত করে নি। শিক্ষা-দীক্ষা, সাহস-বুদ্ধিমত্তায়, রুচিশীলতা এবং ব্যক্তিত্ববোধে সে নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তুলেছে। আসলে বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়ে আসার গরজ বা আকুতি নারীর নিজের মধ্যে জেগে ওঠা ভীষণ প্রয়োজন। তা না হলে পুরুষের তাগিদ বা শক্তি কখনোই তাদের সেই সম্মানজনক অবস্থানে পৌঁছে দিতে পারবে না।

সবশেষে বলা যায় রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন মেয়েরা শুধু আক্ষরিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়ে, আন্তরিকভাবে শিক্ষিত হয়ে উঠুক। তার জন্য সবসময় যে বিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে এমনও নয়। রবীন্দ্রনাথের এই আন্তরিক শিক্ষার চূড়ান্ত পরিণতি হয়েছে 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে। এখানে মৃণালের গৃহত্যাগের মধ্যে দিয়ে তার ব্যক্তিত্বের যে রূপটি ফুটে উঠেছে তাকে বলা যেতে পারে অন্তর্শিক্ষারই ফল। এখানে এসে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনায় নারী-পুরুষ একাকার হয়ে গেছে।

CamScanner

আসলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন 'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে' । অর্থাৎ শিক্ষা তাই যা মানুষকে মুক্তি দেয় । মৃণালের আত্মোপলব্ধি তাকে মুক্তির ঠিকানা দিয়েছিল বলেই সে আর সংসারের পাঁকচক্রে ফিরে আসে নি । অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের নারীশিক্ষা ভাবনা শেষ পর্যন্ত নারীকে মানবত্বে উত্তীর্ণ হওয়ারই প্রেরণা দেয় ।

তথ্যনির্দেশ

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'নারী', 'কালান্তর', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : ভাদ্র, ১৪১৬ (প্রকাশ: বৈশাখ, ১৩৪৪) পৃষ্ঠা : ৩৬১-৩৬৩

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছেলেবেলা', রবীন্দ্র-রচনাবলী' (ত্রয়োদশ খণ্ড) বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : পৌষ, ১৪১৭, পৃষ্ঠা : ৭১১

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'স্ত্রীশিক্ষা', 'শিক্ষা', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পরিবর্ধিত সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ : ভাদ্র, ১৪১৭ (প্রকাশ : ১৩১৫), পৃষ্ঠা : ১৩৮

৪. ঐ, পৃষ্ঠা : ১৩৯

৫. ঐ, পৃষ্ঠা : ১৪০

৬. ঐ, পৃষ্ঠা : ১৩৯

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ', 'সমাজ', 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' (ত্রয়োদশ খণ্ড) পৃষ্ঠা : ২৮

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রমাবাইয়ের বক্তৃতা উপলক্ষে পত্র', 'পরিশিষ্ট', 'সমাজ', 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' (ষষ্ঠ খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : ভাদ্র, ১৪১৭, পৃষ্ঠা : ৬৭৯

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'নারী', 'কালান্তর', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : ভাদ্র, ১৪১৬ (প্রকাশ: বৈশাখ, ১৩৪৪) পৃষ্ঠা : ৩৬৩

১০. ঐ, পৃষ্ঠা : ৩৬৩-৩৬৪

১১. ঐ, পৃষ্ঠা : ৩৬৫

১২. ঐ, পৃষ্ঠা : ৩৬৫

১৩. ঐ, পৃষ্ঠা : ৩৬৬

১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চিঠিপত্র' (ত্রয়োদশ খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রকাশ মার্চ, ১৯৯২, পৃষ্ঠা : ১৩৯

১৫. ঐ, পৃষ্ঠা : ১৪২

১৬. ঐ, পৃষ্ঠা : ১৩৯

১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র', 'বিশ্বযাত্রী', 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' (দশম খণ্ড), পৃষ্ঠা : ২৯০

১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'স্ত্রীশিক্ষা', 'শিক্ষা', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পরিবর্ধিত সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ : ভাদ্র, ১৪১৭ (প্রকাশ : ১৩১৫) পৃষ্ঠা : ১৩৭

১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চিরকুমার সভা', 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' (ষষ্ঠ খণ্ড) পৃষ্ঠা : ৬৯৬

CamScanner

শিপ্রা সরকার*

রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ও শিক্ষাচিন্তার স্বরূপ

সারসংক্ষেপ : *সত্য-শিব-সুন্দরের পূজারী রবীন্দ্রনাথ বিশ্বব্যাপী পরম এক আধ্যাত্মিক শক্তিতে ছিলেন গভীরভাবে বিশ্বাসী। তাঁর জীবনদর্শন ও জগৎভাবনার মূলে ছিল উপনিষদ। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের প্রগাঢ় সম্পর্কের কথা রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। পৃথিবীর সকল মানুষের ওপর তাঁর ছিল সমান দৃষ্টি। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিগূঢ় সম্পর্ক-বিষয়ক প্রত্যয় রবীন্দ্র-জীবনদর্শনের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তাতেও তাঁর এই প্রকৃতিচেতনার ছায়াপাত ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়কে মানব-সংস্কৃতি অনুশীলনের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কবি। শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীল কবি-প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছে ঔপনিবেশিক শাসক-প্রবর্তিত প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শান্তিনিকেতন। এ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথের ঔপনিবেশবাদ-বিরোধী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে, তেমনি প্রকাশ ঘটেছে তাঁর সৃজনশীল শিক্ষাদর্শন।*

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূলত একজন রোমান্টিক কবি। কিন্তু মানবজীবনের এমন কোনো প্রান্ত নেই, যেখানে তাঁর চিন্তার স্পর্শ না পড়েছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের সার্থক সমন্বয় ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববীক্ষায়। দার্শনিক চিন্তাধারার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভাববাদী (Idealist)। সত্য-শিব-সুন্দরের পূজারী রবীন্দ্রনাথ বিশ্বব্যাপী পরম এক আধ্যাত্মিক শক্তিতে ছিলেন গভীরভাবে বিশ্বাসী। তাঁর জীবনদর্শন ও জগৎভাবনার মূলে ছিল উপনিষদ। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের প্রগাঢ় সম্পর্কের কথা রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। পৃথিবীর সকল মানুষের উপর তার ছিল সমান দৃষ্টি। অর্থনীতি বা রাজনীতি নয়, তাঁর আন্তর্জাতিকতাবাদের মৌল ভিত্তি ছিল আধ্যাত্মিকতা। ভারত উপমহাদেশে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ব-নাগরিক। তাঁর বিশ্বাত্মবোধের মধ্যে জাত-পাতের কোনো প্রভেদ ছিল না। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মানবকল্যাণচেতনাই ছিল তাঁর সাহিত্য ও কর্মের কেন্দ্রীয় প্রাণশক্তি। রবীন্দ্রনাথের মানবপ্রেম ও অধ্যাত্মচেতনা পরস্পর পরিপূরক। মানুষের মাঝেই তিনি উপলব্ধি করেছেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব, মানুষকেই বসিয়েছেন দেবতার আসনে, উচ্চারণ করেছেন মানবচেতনার এই অম্লান বাণী–'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ'। লাঞ্ছিত বঞ্চিত পতিত অসহায় মানুষের কথা তিনি পৌনঃপুনিক বলেছেন তাঁর গদ্যে-পদ্যে-নাটকে। রবীন্দ্রনাথ কেবল একজন রোমান্টিক সাহিত্যিক নন; তিনি বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী লেখকও বটে।[১]

*সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ

CamScanner

দীর্ঘ জীবনের সাহিত্য ও কর্মসাধনায় মানুষের মনকে সকল প্রকার যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাসের হাত থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সমাজের যে-সব ক্ষেত্রে বুদ্ধির উদ্বোধন কিংবা মূঢ়তার পরাভব লক্ষ করেছেন, তা-ই তিনি পাঠকের সামনে সোৎসাহে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। মানুষের জাগরণ বলতে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন মানুষের মোহমুক্ত বুদ্ধির জাগরণ, ক্ষুদ্র সংকীর্ণ নিষেধের শাসন থেকে মুক্তি, অনৈক্যবোধ থেকে মুক্তি।[২] বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের মানবধর্ম ও বিশ্বমৈত্রীবোধ পরস্পর সংযুক্ত। এই মানবধর্ম ও বিশ্বমৈত্রীবোধই রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের কেন্দ্রীয় পরিচয়-সূত্র। সাহিত্যে, মননে, কর্মে, ধর্মোপলব্ধিতে, সমাজসেবায় যতই বাঙালি সামনের দিকে অগ্রসর হয়েছে, ততই পশ্চিম-পৃথিবীর সঙ্গে তার সংযোগ ঘনিষ্ঠ হয়েছে।

প্রাচ্য-প্রতীচ্যের এই সংযোগবাসনা রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ও জগৎভাবনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় 'কালান্তর' প্রবন্ধে উচ্চারিত রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধি–

> তাই ভেবে দেখলে দেখা যাবে, এই যুগ য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের গভীর সহযোগিতারই যুগ। বস্তুত, যেখানে তার সঙ্গে আমাদের চিত্তের, আমাদের শিক্ষার অসহযোগ, সেইখানেই আমাদের পরাভব। এই সহযোগ সহজ হয়, যদি আমাদের শ্রদ্ধায় আঘাত না লাগে। পূর্বেই বলেছি, য়ুরোপের চরিত্রের প্রতি আস্থা নিয়েই আমাদের নবযুগের আরম্ভ হয়েছিল; দেখেছিলুম জ্ঞানের ক্ষেত্রে য়ুরোপ মানুষের মোহমুক্ত বুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করেছে এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বীকার করেছে তার ন্যায়সংগত অধিকারকে। ('কালান্তর')

রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনে মানবকল্যাণচেতনা ও বিশ্বজাতীয়তার ধারণা যে কীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা বোঝা যায় ১৯৩০ সালে লেখা তাঁর একটি প্রবন্ধ থেকে। "পথে ও পথের প্রান্তে" শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন– 'বিশ্বজাতীয়তার উদ্যম সঙ্ঘীভূত হয়ে উঠেছে জেনিভায়। লীগ অফ নেশনে ঠিক সুর বাজে নি–হয়ত বাজবেও না–কিন্তু আপনা আপনিই ওই শহর সমস্ত জগতের মহানগরী হয়ে উঠছে। যাদের প্রকৃতি বিশ্বপ্রাণ তারা আপনা আপনি ঐখানে এসে মিলবে। ঐ ক্ষেত্রে বর্তমান যুগের একটা মহাকল্যাণ শক্তির উদ্‌বোধন ঘটছে বলে আমার বিশ্বাস।' বৃহৎ বিশ্বের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে বিশ্বমানবতায় বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন, তার অব্যর্থ প্রমাণ পাওয়া যায় উপর্যুক্ত উদ্ধৃতাংশে। রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনায় মানবচেতনা কীভাবে বিকশিত হয়েছে, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সমালোচক লিখেছেন–

> জাগরণের অর্থ যদি এই হয় যে ক্ষুদ্রের ও সংকীর্ণের বন্ধন থেকে মুক্তি, তাহলে স্বীকার করতে হয় রবীন্দ্রনাথ চল্লিশ থেকে সত্তর–জীবনের এই তিরিশ বৎসর কেবলই বেড়া ভেঙেছেন, নিজেকে বারবার অতিক্রম করেছেন, বৃহৎ থেকে বৃহত্তরে যাত্রা করেছেন। প্রথম যৌবনের জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেম, তারপর উপনিষদবাদ, তারপর তপোবন ও আনন্দবাদ, ব্রাহ্মসমাজ-নির্দিষ্ট ব্রহ্মোপসনা, জীবনে ও কর্মে ব্রহ্মোপলব্ধির সাধনা–সবই রবীন্দ্রনাথ অতিক্রম করেছেন, শেষ পর্যন্ত মানব-ঐক্যবোধে উপনীত হয়েছেন। সত্যের রূপ ও প্রেরণা বারবার পরিবর্তিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত বিশ্বমানবতায় পৌঁছেছে–রবীন্দ্রনাথের এই শেষ ও সর্বোত্তম সত্যোপলব্ধি। রবীন্দ্রনাথ শেষদিকে গল্প-কবিতা-উপন্যাস ও ছবিতে যেরকম দেশকালের গণ্ডিকে অতিক্রম করে মননপন্থী ও অমূর্তপন্থী হয়ে উঠেছিলেন, সমাজচিন্তা তথা মানবচিন্তার ক্ষেত্রেও সেইরূপ অগ্রসর হয়েছিলেন।[৩]

চিরায়তকালের মানবসত্যকে রবীন্দ্রনাথ কখনো প্রচলিত ধর্মগ্রন্থে বা আচার-অনুষ্ঠানে প্রত্যক্ষ করেন নি, বরং একে তিনি সন্ধান করেছেন ব্রাত্য-মানুষের চিত্তলোকের অমেয় অতুল অপরিসীম ঐশ্বর্যের মাঝে। মানবমহিমার বন্দনাই রবীন্দ্রনাথের মানবচেতনার মূল কথা নয়, বরং তাঁর মূল লক্ষ্য মানবাত্মার উদ্বোধন।

CamScanner

'পত্রপুট' কবিতায় আছে রবীন্দ্রনাথের এই স্বকীয় মানবচেতনার পরিচয়, যা পরোক্ষে তাঁর প্রাতিস্বিক জীবনাদর্শেরই পরিচায়ক–

আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন
সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল
দেবলোক থেকে
মানবলোকে
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে
আর মনের মানুষের আমার অন্তরতম আনন্দে।
('পত্রপুট')

–বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের মানবচেতনা এই পরম সত্যোপলব্ধির দিব্যবিভায় প্রোজ্জ্বল, শাশ্বতবোধে উজ্জ্বল, চিরায়ত মাঙ্গলিক চেতনায় দীপ্যমান।

রবীন্দ্রনাথের এই মানবচেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর সমাজচেতনায়। বিশ্বমানবমুক্তির ঐকাগ্র্য আকাঙ্ক্ষাই তাঁর সমাজচেতনার কেন্দ্রীয় প্রত্যয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন–'মানুষের মধ্যে স্বার্থগত আমির চেয়ে যে বড়ো আমি, সেই আমির সঙ্গে সকলের ঐক্য, তার কর্ম সকলের কর্ম। একলা আমির কর্মই বন্ধন, সকল আমির কর্ম মুক্তি।' এই প্রত্যয়ে স্থিত থেকে রবীন্দ্রনাথের সকল কর্ম, তাঁর আদর্শবাদী চিন্তা, বৈপ্লবিক সংগ্রাম এবং সমাজকল্যাণ চিন্তা একটি বিন্দুতে সংহতি লাভ করেছিল। মানুষের ব্যক্তিসত্তাকে রবীন্দ্রনাথ সমাজজীবনের অংশ হিসেবেই বিবেচনা করেছেন। তিনি মানুষকে বিচার ও মূল্যায়ন করেছেন তার সমগ্র জীবন দেশ সমাজ ও সভ্যতার পটভূমিতে স্থাপন করে। মানুষের সামাজিক অস্তিত্বকে তিনি গভীরভাবে স্বীকার করেছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সদর্থক উপাদানগুলো তিনি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং বাঙালি জনগোষ্ঠীর জন্য সামঞ্জস্যময় এক সমাজের কথা চিন্তা করেছেন। সমগ্র জীবন ধরে এবং বিপুল সাহিত্যকর্মে তিনি যে মানুষের কথা বলেছেন, সে-মানুষ কোন ব্যক্তিমানুষ নয়, গুণে-কর্মে-সাধনায় পূর্ণাঙ্গ সামাজিক মানুষ। বস্তুত, মানুষের পুঞ্জীভূত মানবিক গুণের সমাহার দিয়ে সামাজিক মানুষের কল্যাণ আকাঙ্ক্ষাই ছিলো রবীন্দ্রনাথের সমাজদর্শনের মূল কথা।[৪]

দীর্ঘ আশি বছরের জীবনবৃত্তে উপমহাদেশের প্রায় প্রতিটি সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনায় রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে আলোড়িত হয়েছেন। কোনো কোনো সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংযোগ ছিল অতি নিবিড় ও প্রত্যক্ষ। 'সোনার তরী' কাব্যের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন–'মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল। তাদের জন্য চিন্তা করেছি, কাজ করেছি, কর্তব্যের নানা সংকল্প বেঁধে তুলেছি'; সেই সংকল্পের সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন এই সত্যোপলব্ধি–

CamScanner

> আজ আমি বলিতেছি, ভারতবর্ষের দীনতম কৃষককেও আমি ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিব, আর ওই যে রাঙা সাহেব টমটম্ হাকাইয়া আমার সর্বাঙ্গে কাদা ছিটাইয়া চলিয়া যাইতেছে, উহার সহিত আমার কানাকড়ির সম্পর্ক নাই। ('ইংরাজ ও ভারতবাসী')

রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শ গঠনে তাঁর বাল্যের পরিবেশ, পারিবারিক ঐতিহ্য ও সমকালীন প্রেক্ষাপট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য রবীন্দ্র-গবেষক সৈয়দ আকরম হোসেনের এই বিবেচনা–'ঐতিহ্যপুষ্ট রবীন্দ্রপ্রতিভাশক্তি পরিবেশ-পরিপ্রেক্ষিত সূত্রে যেমন সর্বভারতীয় ঐতিহ্যের গভীরতম স্তরে রসগ্রাহী শিকড় সঞ্চারে সক্ষম হয়েছিল ; ঠিক তেমনি নব্য ইয়োরোপীয় গণতান্ত্রিক কর্মবাদী সভ্যতা ও শিল্প-সংস্কৃতির বিস্তৃত এলাকায় পত্রল শাখা-প্রশাখা প্রসারিত করে শক্তি সংগ্রহে ছিল স্বচ্ছন্দচারী। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিক্ষমপ্রজ্ঞা পারিবারিক বিচিত্রমুখী শিল্পসাধনার সদা উদ্যম তপস্যা ও সৃষ্টিশীল আবহওয়া থেকে পুষ্পিত হওয়ার অন্তরাবেগ সঞ্চয়ে সমর্থ হয়েছিল।'[৫] রবীন্দ্রনাথের পরিবারের সদস্যবৃন্দ সমকালীন সময়ে সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধনে যে ভূমিকা রেখেছিলেন, তার প্রভাব পড়েছে রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনা ও শিক্ষাচিন্তায়। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় সমকালীন প্রেক্ষাপট সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত ভাষ্য–

I was born in what was then the metropolic of British rule. My ancestors came floating to Calcutta upon the earliest tide of the East India Company. The conventional code of life for our family thereupon became a confluence of three cultures : The Hindu, the Mohammedan and the British,_ the all-pervading fact around my boyhood being the modern city, newly built by a company of Western traders, and the spirit of the modern time seeking its unacconstomed path into our life, stumbling against countless anomalies.[6]

সর্বমানবের প্রতি, সর্বজীবের প্রতি, জীবনের প্রতি অসীম মমত্ববোধ, প্রকৃতির সঙ্গে তার নিগূঢ় আত্মীয়তা, জাতি ও সমাজের প্রতি তার কর্তব্যবোধ, এই সবই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনদর্শনের সারকথা। এই চৈতন্যময় বিশ্ববোধের ধারণা তাঁর সমস্ত ভাবনা ও কর্মকে আচ্ছন্ন করেছিল। উপনিষদের ঋষিদের মতো রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনা ছিল মহাচৈতন্যকে আপনার মধ্যে উপলব্ধি করার সাধনা, আপনাকে ব্যাপ্ত চৈতন্যের মধ্যে খুঁজে পাওয়ার আরাধনা। স্মরণ করা যায় তাঁর আত্মভাষ্য– 'এই যে বাধাহীন চৈতন্যময় বিশ্ববোধটি অত্যন্ত সত্য হয়ে উঠেছিল এই কথাটি আজ আমরা যেন সম্পূর্ণ গৌরবের সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করি। এই কথাটি স্মরণ করে আমাদের বক্ষ যেন প্রশস্ত হয়, আমাদের চিত্ত যেন আশান্বিত হয়ে ওঠে। যে বোধ সকলের চেয়ে বড় সেই বিশ্ববোধ, যে লাভ সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সেই ব্রহ্মলাভ–কাল্পনিকতা নয়।' (*শান্তিনিকেতন*)।

CamScanner

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিগূঢ় সম্পর্ক-বিষয়ক প্রত্যয় রবীন্দ্র-জীবনদর্শনের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তাতেও তাঁর এই প্রকৃতিচেতনার ছায়াপাত ঘটেছে। দার্শনিক হেগেলের মতো রবীন্দ্রনাথও মানুষ প্রকৃতির পারস্পরিক সম্বন্ধটিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের চোখে মানুষ ও প্রকৃতি, জীবন ও মৃত্যু এসব পরস্পর পরিপূরক। রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে আবিষ্কার করেছেন গভীর এক ঐক্যসূত্র। এই বোধ রবীন্দ্র-জীবনদর্শনের বিশিষ্ট এক প্রান্ত। এই ঐক্যবোধের অভাব আছে বলে রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন। মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট' কাব্য সমালোচনা-সূত্রে তিনি এই ঐক্যবোধের অভাবের কথা বলেছেন, শনাক্ত করেছেন জীবের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদের প্রান্ত–'মিল্টনের *Paradise Lost* এ কাব্যে আদি মানব-দম্পতির স্বর্গারণ্যে বাস বিষয়টি এমন যে, অতি সহজেই সেই কাজে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির মিলনটি সরল প্রেমের সম্বন্ধে বিরাট ও মধুর হয়ে প্রকাশ পাবার কথা। কবি প্রকৃতি-সৌন্দর্যের বর্ণনা করেছেন। জীব-জন্তুরা সেখানে হিংসা পরিত্যাগ করে একত্রে বাস করছে, তা-ও বলেছেন, কিন্তু মানুষের সঙ্গে তাদের কোন সাত্ত্বিক সম্বন্ধ নেই। এই যে নিখিলের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ, এর মূলে একটি গভীরতর বিচ্ছেদের কথা আছে। এর মধ্যে 'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ', জগতে যা কিছু আছে সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা সমাবৃত করে জানবে, এই বাণীটির অভাব আছে' (শিক্ষা)। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বচরাচরকে এক মহৎ প্রাণের দ্বারা সমাবৃত করে দেখেছিলেন। সর্বপ্রাণনা ও প্রাণপ্রেতির উৎস যিনি, তিনিই এই বিশ্বপ্রাণের অধিশ্বর। রবীন্দ্রনাথ এই বিশ্বপ্রাণেরই লীলা ও প্রকাশ দেখেছেন এই ভুবনে এবং ভুবনান্তরে।[৭] জগতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছেন অবিমিশ্র এক সংযোগ; বলেছেন এই কথা–'বাল্যকাল থেকে অতি নিবিড়ভাবে আনন্দ পেয়েছি বিশ্বদৃশ্যে।' 'বনবাণী' কবিতাতে আছে রবীন্দ্রনাথের এই জীবনাদর্শের পরিচয়–

আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে,
পাকে পাকে ফেরে ফেরে
আমার জীবন দিয়ে জড়ায়েছি এরে,
প্রভাত সন্ধ্যার
আলো অন্ধকার
মোর চেতনায় গেছে ভেসে,
অবশেষে
এক হয়ে গেছে আজ আমার জীবন
আর আমার ভুবন।
ভালোবাসিয়াছি এই জগতের আলো,
জীবনেরে তাই বাসি ভালো।।
('বনবাণী')

মধুময় দ্যুলোকে-ভূলোকে রবীন্দ্রনাথের অবিশ্রাম সঞ্চরণ। পৃথিবীর পার্থিব রূপগুলোকে রবীন্দ্রনাথ কখনো বড় করে দেখেন নি কিংবা দেখান নি; তাঁর কাছে সব সময় প্রাধান্য পেয়েছে পৃথিবী ও প্রকৃতির চিন্ময় সত্তা। এক চৈতন্যময় বিশ্ববোধের ধারণা সত্য হয়ে দেখা দেয় রবীন্দ্র-জীবনদর্শনে।

CamScanner

এতকাল যা ছিল একান্তই তত্ত্বকথা, এবার তা মূর্ত হয়ে উঠলো রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনের বৃহত্তর পরিধিতে এসে। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিবোধের স্পর্শে জীবন ও দর্শন একাকার হয়ে মিলে গেছে, তাঁর কাছে এসে ঘুচে গেছে মনন ও সাধনের বিপুল পার্থক্য ।৮ রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের এই স্বকীয়তার আলোকেই গড়ে উঠেছে তাঁর প্রাতিস্বিক শিক্ষাচিন্তা। বিশ্বাত্মবোধের অনুপম এক ব্যঞ্জনা তাঁর শিক্ষাচিন্তার মর্মকোষে সদা প্রবাহিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম তিনি যখন রাখেন 'বিশ্বভারতী', তখন সহসাই আমরা সেখানে খুঁজে পেতে পারি রাবীন্দ্রিক বিশ্ব-চেতনার নির্ভুল পরিচয়।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন

রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন। দার্শনিক চিন্তার দিক থেকে তিনি ছিলেন ভাববাদী (idealist), আবার প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তার বাণী-সূত্রে তাঁকে প্রকৃতিবাদী (naturalist) বলেও আখ্যায়িত করা যায়। অপরদিকে কর্মসূত্রে তিনি ছিলেন একান্তই প্রয়োগবাদী (pragmatist)। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনে এই তিন প্রবণতারই প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য নিম্নোক্তভাবে শনাক্ত করা যায়–

মানুষ ও প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্ক

রবীন্দ্রনাথের মতে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে এর বিচ্ছিন্নতা। রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে বিশ্বাস করেন, প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে রয়েছে এক নিবিড় আত্মীয়তা-বন্ধন। তিনি বিশ্বাস করেন, প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসে শিক্ষার্থীর দেহমন সুগঠিত হয় এবং ক্রমে সে পরমসত্তাকে উপলব্ধি করতে শেখে। তাই প্রাচীন ভারতীয় তপোবনধর্মী শিক্ষার আদর্শে তিনি স্থাপন করেছেন তার অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শান্তিনিকেতন। শান্তিনিকেতনে শিক্ষার্থীর সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক ছিল যেমন সহজ, তেমনি স্বতঃস্ফূর্ত।

সর্বভারতীয় আদর্শ ও বাঙালি সংস্কৃতি

রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের অনুপম সমন্বয়চিন্তার প্রতিফলন বিশেষভাবে লক্ষযোগ্য। কিন্তু তার শিক্ষাদর্শনে এই সমন্বয়চিন্তার তেমন প্রভাব পড়ে নি। বস্তুত, তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনায় কোনো বিদেশি ভাবনা অনুকরণের প্রচেষ্টা নেই। তিনি ভারতীয় ঐতিহ্য এবং বাঙালি সংস্কৃতিতে গভীরভাবে বিশ্বাসী ছিলেন এবং এই দুই উৎস থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তা শিক্ষা-ব্যবস্থার মাধ্যমে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন। যে শিক্ষা দেশজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি থেকে শিক্ষার্থীকে উন্মুলিত করে, রবীন্দ্রনাথ সে-শিক্ষার ঘোর বিরোধী ছিলেন।

শিক্ষা কার্যক্রমে বিজ্ঞানমনস্কতা

শিক্ষা-পরিকল্পনায় ভারতীয় ঐতিহ্য ও বাঙালি সংস্কৃতিকে নিবিড়ভাবে আঁকড়ে থাকলেও পশ্চিমা বিজ্ঞানচেতনাকে তিনি উপেক্ষা করেন নি। এক্ষেত্রে তিনি প্রাচ্য সংস্কৃতি এবং প্রতীচ্য বিজ্ঞানকে সমন্বিত করার পক্ষপাতী ছিলেন। পাশ্চাত্য থেকে বিজ্ঞানের যে জ্ঞানভাণ্ডার ভারতে এসেছে, শিক্ষাক্রমে (curriculum) তা তিনি আগ্রহের সঙ্গেই অন্তর্ভুক্ত করেছেন। শিক্ষা-পরিকল্পনায় আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষাকে তিনি সর্বদা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন।

CamScanner

মানবপ্রেম

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মানবপ্রেমভাবনা। মানুষের মধ্যে কৃত্রিম অসমতাকে তিনি কখনোই স্বীকার করেন নি। সকল মানুষের প্রতিই ছিল তাঁর গভীর ভালোবাসা। রবীন্দ্র-জীবনদর্শনে যেমন মানবচেতনার বিশিষ্ট আসন আছে, তেমনি তাঁর শিক্ষাদর্শনেও আছে মানবচেতনার প্রতিফলন। উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ সকলকেই তিনি সমান জ্ঞানে বিচার করেছেন। এই মানবচেতনা তাঁর শিক্ষাব্যবস্থায় নিয়ে এসেছে ঐক্য, সংহতি ও সাম্যের ধারণা।

স্বাধীনতা স্পৃহা

রুশো, ফ্রয়েবেল ও ডিউইর মতো রবীন্দ্রনাথও স্বাধীনতা ও আনন্দের মধ্য দিয়ে শিশুকে শিক্ষা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। কঠোর শাসন ও নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে শিশুকে কাজের অবাধ স্বাধীনতা দিলে শৃঙ্খলা রক্ষায় কোন সমস্যা থাকবে না, বরং তার চিন্তা ও বিচারশক্তির উন্মেষ ঘটবে–একথা রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন।[৯]

সৌন্দর্যানুভূতি

রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে সুন্দরকে কামনা করেছেন, তিনি ছিলেন সুন্দরের একজন শ্রেষ্ঠ উপাসক। তাই তাঁর মতে, শিক্ষা যাতে শিক্ষার্থীর চেতনায় সৌন্দর্যবোধ জাগ্রহ করে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। বিশ্বে যে সৌন্দর্যানুভূতির আনন্দধারা নিত্য প্রবাহিত হয়ে চলেছে, শিক্ষার্থীকে তার সঙ্গে পরিচয় করে দেওয়াকে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার প্রধান কাজ বলে মত প্রকাশ করেছেন।

নারীশিক্ষা

নারীশিক্ষার ধারণা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের মতে নারী-পুরুষের শিক্ষার সমান অধিকার থাকা প্রয়োজন। নারীকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। পরিবারের প্রয়োজন, গৃহস্থালী, স্বাস্থ্য ও সন্তান-পরিচর্যা–এসব দিক নারীশিক্ষা-পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্তির কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। গৃহ ও গৃহের পার্শ্ববর্তী পরিবেশ সম্পর্কেও নারীকে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। এছাড়া পরিবারের আয় বৃদ্ধির জন্য পল্লির নারীদের বৃত্তিমূলক কিংবা কুটির শিল্পধর্মী কাজে প্রশিক্ষণ গ্রহণ জরুরি বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। মোটকথা, নারীশিক্ষার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের ধারণা ছিল বেশ স্বচ্ছ ও উদার।

আত্মপ্রকাশ ও আত্মবিকাশ

শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আত্মপ্রকাশ ও আত্মবিকাশের কথা রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। শিক্ষাক্রমে এমন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, যাতে শিক্ষার্থীর আত্মচেতনা জাগ্রত হয়। এ জন্য তোতাকাহিনী-নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থাকে তিনি বর্জন করার কথা বলেছেন; পরিবর্তে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন আত্মবিকাশধর্মী আনন্দময় শিক্ষাব্যবস্থা। তিনি মনে করতেন, শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাক্রম এমন হবে যাতে শিক্ষার্থীর সৃজনী প্রতিভা বিকাশের সুযোগ ঘটে। তাঁর মতে প্রকৃতির সাহচর্যে অঙ্কন, বাঁশ ও মৃৎশিল্প, ভাস্কর্য প্রভৃতি সৃজনমূলক কাজে শিক্ষার্থীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই কেবল সঞ্চারিত হয় না, তার মনেরও যথেষ্ট বিকাশ ঘটে। এ ধরনের সৃজনধর্মী কাজ শিক্ষার্থীকে পড়ালেখার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট করে, তাকে করে তোলে স্বপ্নচারী।

CamScanner

শিশু-শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাচিন্তায় শিশু-শিক্ষার্থীরা সবিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। শিশুদের জন্য তিনি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাদের শিক্ষাক্রম নিয়ে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর সার্বিক বিকাশের পথ সৃষ্টির উপর রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে, শিশু-শিক্ষার প্রধান কাজ হবে শিশুর দেহমন ও আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন। শিশুদের শিক্ষাক্রমে,বইয়ের বোঝা না চাপিয়ে, তাদের প্রকৃতিসংলগ্ন করে আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা রবীন্দ্রনাথ পৌনঃপুনিক উচ্চারণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ও শিক্ষার লক্ষ্য

লর্ড মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার কঠোর সমালোচক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। লর্ড মেকলের তথা ইংরেজ আমলের শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কাজ-চালানোর মতো ইংরেজি-জানা কিছু কেরানী সৃষ্টি করা, যারা ইংরেজ সিভিলিয়ান ও দেশীয় লোকদের মধ্যে দোভাষীর কাজ করবে। মেকলের বক্তব্য থেকেই অনুধাবন করা যায় ইংরেজ শাসকদের শিক্ষানীতির মৌল উদ্দেশ্য। নিজেদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে ঔপনিবেশিক শাসক মেকলে লিখেছেন–

> We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals and in intellet.[১০]

–মেকলের শিক্ষানীতির এই প্রক্রিয়া বাংলার মধ্যশ্রেনিকে জন্মসূত্রেই স্বদেশ-স্বজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন করার ক্ষেত্রে দূরসঞ্চারী ভূমিকা পালন করেছে। সমকালে, ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত হওয়ায় অর্থই ছিল স্বদেশ-স্বজাতি-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। বিদ্যা ও বিত্তের বিকৃত বিকাশ নব-উদ্ভূত মধ্যশ্রেণির চেতনায় কেবল পরিবার-সমাজ আর ঐতিহ্যবিচ্ছিন্নতাই সৃষ্টি করে নি, তা জন্ম দিয়েছিল গভীর মানসিক বিচ্ছিন্নতাও।[১১]

ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসক-প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার এই দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা ও অসৎ উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা বর্জন করে প্রবর্তন করতে চেয়েছেন নিজস্ব এক শিক্ষাপদ্ধতি। রবীন্দ্রনাথের মতে, কেরানি সৃষ্টি করা নয়, বরং শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ সৃষ্টি করা। রবীন্দ্রনাথের মতে প্রকৃত মানুষ সৃষ্টি করাই হবে শিক্ষার মূল লক্ষ্য। সামাজিক গুণাবলি অর্জনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির আত্মচেতনার বিকাশ সাধনই, রবীন্দ্রনাথের মতে, শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তি ও সমাজকে সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। বস্তুত, তিনি শিক্ষার সমাজতান্ত্রিক ও ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। নিচে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত সূত্রকারে উপস্থাপিত হলো–

CamScanner

১. বৌদ্ধিক বিকাশ : শিক্ষা অজ্ঞানতা দূর করে, ত্বরান্বিত করে মানুষের বৌদ্ধিক বিকাশ। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশ হয় না বলেই রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। পুথিভিত্তিক জ্ঞান অর্জন ও প্রচলিত পরীক্ষাকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার কঠোর সমালোচক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মতে, স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশই হবে শিক্ষার লক্ষ্য। তিনি লিখেছেন–'যে শিক্ষা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত ও সক্রিয় করে, আমাদের মনকে অবুদ্ধির প্রভাব থেকে মুক্ত করতে পারে, সেই শিক্ষার দ্বারাই আমাদেরও সমস্ত দুঃখ-দুর্গতির অবসান ঘটতে পারে।' (শিক্ষা)

ত্য

২. বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ : অর্থ শিক্ষার্থীর মনে কৌতূহল ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি জাগ্রত করা শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে র বীন্দ্রনাথ মনে করেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি জাগ্রত হলেই একজন শিক্ষার্থী জীবন ও জগতের রহস্য অ ষা আবিষ্কারে উদ্যোগী হবে, তার চেতনা থেকে দূর হবে অজ্ঞানতা অন্ধকার ও কুসংস্কার। ' তি

ন হওয়া থবে

বারবার সতর্ক করেছে র্থীর দৈহিক বি কাশ যাতে স্বাভাবিকভাবে হয়, সে-দিকে শিক্ষার লক্ষ্য থাকা পারে না। তাই তাঁর শিক্ষ ব্যক্ত করেছেন। পাঠের বোঝা বইতে গিয়ে এদেশের শিক্ষার্থীরা যে মাতৃভাষার অনুশীলনের ফ রবীন্দ্রনাথের বেদনার অন্ত ছিল না। তাই তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকার, চিনতে পারে দিতে বলেছেন। শিক্ষার্থীর দৈহিক বিকাশ ও আনন্দময় পাঠের জন্য ল্পনায় মুক্ত পৃথিবীর বুকে খেলাধুলা, নৃত্য-গীত ইত্যাদি আয়োজনের কথা

রবীন্দ্রনাথ

৪. নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ : রবীন্দ্রনাথের মতে যে সর্বব্যাপী পরমসত্তা ছায়ার মতো আমাদের সহগামী, তাকে উপলব্ধি করাই হলো সকল প্রকার শিক্ষার কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য। তাই আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি শান্তিনিকেতনের শিক্ষা-পরিকল্পনায় প্রাধান্য পেয়েছে। ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের জন্য শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন–'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার / চরণ ধূলার তলে।' রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ সাধিত হলেই মানুষ জীবন ও জগৎকে পূর্ণরূপে আবিষ্কার করতে পারবে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় তাঁর নিম্নোক্ত ভাষ্য–

> আমি আশ্রমের আদর্শ রূপে বার বার তপোবনের কথা বলেছি। সে তপোবন ইতিহাস বিশ্লেষণ করে পাইনি। তা পেয়েছি কবির কাব্য থেকেই। তাই স্বভাবতঃই সেই আদর্শকে আমি কাব্যরূপে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছি, বলতে চেয়েছি 'পশ্য দেবস্য কাব্যং', মানবরূপে দেবতার কাব্যকে দেখো। আবাল্য উপনিষদ আবৃত্তি করতে করতে আমার মন বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতাকে অন্তর্দৃষ্টিতে মানতে অভ্যাস করেছে। সে পূর্ণতা বস্তুর নয়, আত্মার। ('তপোবন')

৫. সামাজিক গুণাবলির বিকাশ : রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন সকল মানুষই সমান। মানুষের মাঝেই তিনি খুঁজে পেয়েছেন পরম ব্রহ্মের অস্তিত্ব। যেহেতু জগতের সবকিছুরই উৎস পরম ব্রহ্ম, তাই রবীন্দ্রনাথের চোখে সবাই সমান। এ কারণেই শৈশব থেকেই শিক্ষার্থীকে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সামাজিকতা শিক্ষা দেওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে বলেছেন। তাঁর মতে, শিক্ষার লক্ষ্য হবে ব্যক্তিত্ব ও আত্মচেতনা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক চেতনারও বিকাশ।

CamScanner

রবীন্দ্রনাথের মতে, জীবনের এই পাঁচটি প্রান্তের কোনটিই অপ্রধান নয় ; তাই সবগুলোই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত শিক্ষার এই লক্ষ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি তাঁর শিক্ষাদর্শনে দ্বিমাত্রিক সমন্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন। একদিকে শিক্ষা ব্যক্তির মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় ঘটাবে; অন্যদিকে, শিক্ষা ব্যক্তির সমস্ত রকম বিকাশ ঘটিয়ে সামাজি উন্নয়নে সহায়তা করবে।[১২] পাশ্চাত্য শিক্ষাদার্শনিকদের শিক্ষাচিন্তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের এখানেই পার্থক্য। পাশ্চাত্যের কোনো শিক্ষাদার্শনিক এত ব্যাপক ক্ষেত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে শিক্ষা লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারেন নি। তাই রবীন্দ্রনাথকে কেবল ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক মতবাদের সমন্বয় সাধক বললে বা কেবল ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ ও পাশ্চাত্য বস্তুবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধক বললে ভুল হবে। শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয় করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভাববাদ, প্রকৃতিবাদ, বস্তুবাদ, সমাজতান্ত্রিক মতবাদ, ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদ, উপযোগিতাবাদ সবকিছুর মধ্যে মহা ঐক্য স্থাপন করেছেন, যে ঐক্য একজন শিক্ষার্থীকে প্রকৃত মানুষ করে তুলবে, তাকে করে তুলবে মানবসম্পদ তথা মানবিক পুঁজি। মানুষকে শিক্ষার মা[illegible]মানবিক পুঁজিতে রূপান্তরের এই প্রয়াসই রবীন্দ্রনাথের যুগান্তকারী শিক্ষাদর্শনের পরম লক্ষ্য।

রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শন : পাঠক্রম

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে শিক্ষার মৌল উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীর [illegible] করে এমন পাঠক্রম রচিত হওয়া উচিত। তিনি পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষা[illegible] পরিপূর্ণ রূপটি তুলে ধরতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়কে মানব-সংস্কৃতি অনু[illegible] ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাই পাঠক্রমে সেই সব বিষয়কে অন্তুর্ভুক্ত করার [illegible] দিয়েছেন, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিত্তে মানবসংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি হয়। তিনি তাঁর প্রস্তাবিত পাঠক্রমের মধ্যে ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সঙ্গীত, নৃত্য, পরিবেশ, পল্লি-উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, কুটির শিল্প এবং বেশ কিছু সামাজিক কাজকে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন। শিক্ষার্থীদের ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত করার মানসে রবীন্দ্রনাথ *রামায়ণ* ও *মহাভারত*-কে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্তির কথা বলেছেন।

সভ্যতার অগ্রগতির জন্য বিজ্ঞানের জ্ঞানকে আত্মস্থ করা প্রয়োজন বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। শিক্ষার্থীদের চেতনায় বিজ্ঞান দৃষ্টি বিকাশের জন্য তিনি বিজ্ঞানের নানা বিষয়কে শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্তির পরামর্শ দিয়েছেন। অপরদিকে জীবনের মূল্যবোধ বিকাশের জন্য দর্শনশাস্ত্রের জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাও তিনি অনুভব করেছেন। এ কারণেই শিক্ষাক্রমে বিজ্ঞান ও দর্শন উভয় বিষয়কেই তিনি অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। শিক্ষার্থীরা যাতে বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে, সেজন্য প্রকৃতি-পাঠও তাঁর শিক্ষাক্রমে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। শিক্ষার্থীর চিত্তে নন্দনতাত্ত্বিক কৌতূহল জাগরণের জন্য তিনি শিল্পকলাকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। একই উদ্দেশ্যে সঙ্গীত ও নৃত্যকলাকে তিনি স্থান দিয়েছেন পরিকল্পিত পাঠক্রমে। রবীন্দ্রনাথের পাঠক্রমে স্বদেশের ইতিহাসচর্চা একটা বড় জায়গা পেয়েছে।

CamScanner

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাক্রম ধারণার একটি উল্লেখযোগ্য দিক পল্লি-উন্নয়নভাবনা। শিক্ষার্থীরা যাতে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় সামাজিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারে, সেজন্য শিক্ষাক্রমে সমাজসেবা ও পল্লি-উন্নয়নমূলক কাজের ব্যবস্থা রাখার পক্ষপাতী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বর্তমান কালে কর্ম-অভিজ্ঞতা (work-experience) এবং সৃজনধর্মী উৎপাদনাত্মক কাজের কথা শিক্ষাক্রম প্রণেতারা বিশেষভাবে বলে থাকেন। কিন্তু ভাবতে বিস্ময় জাগে, শতবর্ষ পূর্বেই স্বরচিত শিক্ষাক্রমে রবীন্দ্রনাথ ওইসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। শান্তিনিকেতনের শিক্ষাক্রমে বই-বাঁধাই, কাঠের কাজ, মৃৎশিল্প, অঙ্কন, তাঁতের কাজ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল। বস্তুত, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাক্রম ছিল অভিজ্ঞতা, অধীত জ্ঞান ও কর্মভিত্তিক।

শিক্ষার মাধ্যমে হিসেবে মাতৃভাষার কথা বরীন্দ্রনাথ পৌনঃপুনিক উচ্চরণ করেছেন। তিনি লিখেছেন - 'শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ।' তিনি ইংরেজি শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না। বরং ঐতিহ্যের সঙ্গে সংলগ্ন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার কথা বিশেষভাবে বলেছেন। তিনি বারবার সতর্ক করেছেন এই বলে যে, মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করে কেউ-ই প্রকৃত শিক্ষা লাভ করতে পারে না। তাই তাঁর শিক্ষাক্রমে মাতৃভাষা অনুশীলনের কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে। তাঁর মতে, মাতৃভাষার অনুশীলনের ফলেই শিক্ষার্থীর কল্পনাচারিতা বিকশিত হয়, সে বুঝতে পারে আপন অধিকার, চিনতে পারে নিজেকে।

রবীন্দ্রনাথ-পরিকল্পিত পাঠক্রম কল্পনা এবং বাস্তবের এক নিগূঢ় সমন্বয়। তাঁর শিক্ষাক্রম ছাত্র-ছাত্রীকে তোতাপাখির[১৩] করুণ পরিণতির দিকে ঠেলে দেয় না, বরং তাকে করে তোলে জীবন-মুখী, স্বপ্নমুখী, মানবমুখী ও পরমসত্তামুখী। রবীন্দ্রনাথ যে শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করেছেন, তা বহু বিস্তৃত। শিক্ষার্থীর সামূহিক ও সামগ্রিক বিকাশ সাধনই ছিল রবীন্দ্র-পাঠক্রমের মূল লক্ষ্য।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন: শিক্ষণপদ্ধতি

রবীন্দ্রনাথ সুনির্দিষ্ট কোনো শিক্ষণপদ্ধতির কথা বলেন নি। তাঁর মতে, শিক্ষক যদি উৎসাহী ও গুণসম্পন্ন হন, তবে প্রয়োজন মতো তিনি নিত্য নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করে শিক্ষা দিতে পারেন। কিন্তু প্রচলিত ব্যবস্থায় এরূপ শিক্ষণপদ্ধতি নেই বলে তার তীব্র সমালোচনা করেছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, শিক্ষণপদ্ধতি সার্বিক পরিস্থিতি ও শিক্ষার্থীনির্ভর হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই শিক্ষণ পদ্ধতিকে, তাঁর মত অনুযায়ী, কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়মে আবদ্ধ করা যায় না। উদ্ভাবনধর্মী শিক্ষণপদ্ধতির কথা বলতে গিয়ে তিনি মনুষ্যপ্রকৃতি ব্যাখ্যা করেছেন, লিখেছেন এই কথা–'সুখও তাকে শিক্ষা দেয়; দুঃখও তাকে শিক্ষা দেয়; শাসন নইলেও তাহার চলে না, স্বাধীনতা নইলেও তাহার রক্ষা নাই।' তাই তিনি সুনিদিষ্ট ও সুসংবদ্ধ প্রথাগত কোনো শিক্ষণপদ্ধতি রচনা করেন নি; তবে পদ্ধতি রচনার কতগুলো মৌলিক নীতির উল্লেখ 'করেছেন। শিক্ষণপদ্ধতির ক্ষেত্রে তিনি তিনটি নীতির উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। এই নীতিত্রয় হচ্ছে–

CS CamScanner

(ক) স্বাধীনতার নীতি (Principle of freedom)

(খ) সৃজনশীলতার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের নীতি (Principle of creative self-expression); এবং

(গ) প্রকৃতির সঙ্গে সক্রিয় সংযোগের নীতি (Principle of active communication with nature).

শিক্ষণপ্রক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার্থীদের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদানের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, দেহ-মনের স্বাভাবিক বিকাশের জন্যই পূর্ণ স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন। তবে 'স্বাধীনতা' বলতে তিনি স্বেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দেন নি। রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বাধীনতার অর্থ হলো আত্ম-কর্তৃত্বের অধিকার। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষণপদ্ধতির দ্বিতীয় নীতিতে সৃজনধর্মী সক্রিয়তা ও উদ্যোগের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি মনে করেন, স্বাধীন ভাব থেকেই সৃজন-প্রতিভার বিকাশ সম্ভব। তিনি লিখেছেন–'আমরা মন খাটাইয়া সজীবভাবে যে জ্ঞান উপার্জন করি, তাহা আমাদের মনের সঙ্গে মিশিয়া যায়।' কোমলমতি শিশু ও কিশোর-শিক্ষার্থীদের সক্রিয় করে তোলার জন্য বাগান পরিচর্চার কাজ, লাইব্রেরি গোছানোর কাজ, নাটক রচনা ও অভিনয়, সঙ্গীত ও নৃত্য, বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ – ইত্যাদির উপর তিনি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সবশেষে তিনি এমন এক শিক্ষণপদ্ধতি সৃষ্টির পরামর্শ দিয়েছেন যাতে শিশু, প্রকৃতি এবং সমাজের মধ্যে স্থাপিত হয় এক আত্মিক সম্পর্ক। তিনি প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে রেখে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের কথা বলেছেন। এ উদ্দেশ্যেই তিনি শান্তিনিকেতনে আশ্রম বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। তিনি লিখেছেন – 'আমার আশা ছিল যে, শান্তিনিকেতনের গাছপালা, পাখিই এদের শিক্ষার ভাব নেবে।' মানুষের জন্ম বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবসমাজ – এই দুয়ের মধ্যে। তাই এই উপাদানদ্বয়কে শিক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য পরামর্শ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষণপদ্ধতি-বিষয়ক উপর্যুক্ত নীতিসমূহ সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করেছিলেন শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক বিদ্যালয়ে।[১৪]

সক্রিয়তা বরীন্দ্রনাথের শিক্ষণপদ্ধতির মূল কথা। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় সক্রিয়তার মাধ্যমে সহজে শেখান যায়। তিনি বিশ্বাস করতেন, শিল্পশিক্ষা এবং অন্যান্য কাজ (যেমন- গাছে চড়া, ফুল-ফল পাড়া, বাগান পরিচর্যা, সাঁতার কাটা ইত্যাদি) শিক্ষার্থীর দেহমন গঠনে সাহায্য করে। বিদ্যালয়ের চার দেয়ালের মধ্যে শিক্ষদান অপেক্ষা ভ্রমণের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ভ্রমণের সময় মুক্ত প্রকৃতি ও সমাজদ্ধ মানুষের সঙ্গে শিক্ষার্থীর সংযোগে ঘটে, পর্যটনের ফলে শিক্ষার্থী যে প্রত্যেক অভিজ্ঞতা লাভ করে, বিদ্যালয়ের দেয়াল-ঘেরা কক্ষে তা কখনো সম্ভব হয় না। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন –

> Children have their active sub-conscous mind which like a tree has the power to gather its food from the surrounding atmosphere. For them atmosphere is a great deal more important than rules, methods, buildings, appliance, class-teaching and text books. (*A poet's school*)

CamScanner

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষণপদ্ধতিতে প্রকৃতির রয়েছে বিশাল ভূমিকা। প্রকৃতির নানা উপাদান তাঁর কাছে শিক্ষাপ্রদাণের উপকরণ বলে বিবেচিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন – শিখবার জন্য চক, বোর্ড, পুঁথি ইত্যাদির মতোই অত্যাবশ্যক উপাদান হিসেবে থাকবে আলো বাতাস গাছাপালা মুক্ত আকাশ ইত্যাদি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেবল প্রকৃতির মাঝে মুক্ত হওয়া নয়, বরং মানবসমাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েও আত্মমুক্তি সন্ধানের কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ।[১৫]

প্রসঙ্গত তিনি বলেছেন–

> প্রথমে আমি শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করে এই উদ্দেশ্যে ছেলেদের এখানে এনেছিলুম যে বিশ্বপ্রকৃতির উদার ক্ষেত্রে আমি এদের মুক্তি দেব। কিন্তু ক্রমশ আমার মনে হয় যে, মানুষে মানুষে যে ভীষণ ব্যবধান আছে তাকে অপসারিত করে মানুষকে সর্বমানবের বিরাট লোকে মুক্তি দিতে হবে। আমার বিদ্যালয়ের পরিণতির ইতিহাসের সঙ্গে সেই আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাটি অভিব্যক্ত হয়েছিল। (শান্তিনিকেতন)

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন: ছাত্র-শিক্ষক প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাদর্শনে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সম্পর্কে নানা কথা বলেছেন। শিক্ষা শীর্ষক গ্রন্থে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ককে তিনি এক বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছেন, আধুনিক কালে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর সম্বন্ধটা ক্রমেই অপ্রাকৃত ও শিথিল হয়ে এসেছে। শিক্ষার্থীর অনেক অভিযোগ শিক্ষকের বিরুদ্ধে, শিক্ষকেরও অভিযোগের অন্ত নেই। শিক্ষককে একালের শিক্ষার্থী আর শ্রদ্ধা করে না, সম্মান দেখায় না। শিক্ষকও ছাত্রকে সন্তানবৎ স্নেহ করেন না, তার কল্যাণ কামনা করেন না। শিক্ষক আজ অর্থান্বেষী বুদ্ধিজীবী মাত্র– শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীর সম্বন্ধটুকু আর্থিক লেনদেনের পর্যায়ে নেমে এসেছে। এই অবস্থার অবসান কামনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই তাঁর শিক্ষাদর্শনে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী প্রসঙ্গটা গুরুত্বের সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাচিন্তায় শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে, শিক্ষকও শিক্ষাব্যবস্থার অপরিহার্য এক অংশ। শিক্ষকের সেবামূলক মনোভাব একান্ত জরুরি বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। শিক্ষকের মাঝে তিনি প্রত্যাশা করেছেন চিরন্তন জ্ঞানপিপাসা। তাঁর কাছে জ্ঞানই শক্তি। যিনি পরম জ্ঞানী তিনিই অনন্ত শক্তির অধিকারী। শিক্ষকের চিরন্তন জ্ঞানপিপাসা না থাকলে তিনি কিছুতেই শিক্ষার্থীর জ্ঞানচাহিদা মেটাতে পারবেন না। প্রসঙ্গত তিনি লিখেছেন–

A most important truth which we are apt to forget, is that a teacher can never truly teachers unless he is still learning himself. A lamp can never light another lamp unless it continues to burn its own flame. *(A poet's school)*

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত শিক্ষায় গড়ে তোলার জন্য শিক্ষককে সাত্ত্বিক গুণের অধিকারী হতে হবে। যাদের জাগতিক প্রত্যাশা বেশি, প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা যাদের প্রবল, তাদের এ পথে না আসাই ভালো বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। সমস্ত প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির ঊর্ধ্বে উঠে শিক্ষককে জ্ঞান দান করতে হবে। জাগতিক প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা থাকলে জ্ঞানদান কখনোই সুসম্পন্ন হতে পারে না।

CamScanner

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন – 'জ্ঞানের আদান-প্রদানের ব্যাপারটি সাত্ত্বিক। তাহা প্রাণকে উদ্বোধিত করে। সেইজন্য এইখানেই প্রাণের নাগাল পাওয়া সহজ। এইখানেই গুরুর সঙ্গে শিষ্যের সম্বন্ধ যদি সত্য হয় তবে ইহজীবনে তার বিচ্ছেদ হয় না। তাহা পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্বন্ধের চেয়েও গভীরতর।' (শিক্ষা)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাদর্শনে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কে হবে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহজ। পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে গড়ে উঠবে শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা-প্রদান প্রক্রিয়া। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন – '.....গুরু করবেন বিদ্যা সৃষ্টির সাধনা, শিষ্য করবে বিদ্যা গ্রহণের সাধনা, যেখানে সম্পূর্ণভাবে দান, সেখানেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ সম্ভবপর, যেখানে অধ্যাপকগণ জ্ঞানের চর্চায় স্বয়ং প্রবৃত্ত সেইখানেই ছাত্রগণ বিদ্যাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়' (শিক্ষা)। রবীন্দ্রনাথের মতে, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকের সম্পর্ক হবে আদর্শস্থানীয়। তিনি মনে করতেন, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক না থাকলে শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা-প্রদানের কাজ চলতে পারে না। প্রসঙ্গত তিনি লিখেছেন – 'শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা সম্ভব হয়। যেখানেই সেই শ্রদ্ধার সম্পর্ক নেই, সেখানে আদান-প্রদানের সম্বন্ধ কলুষিত হইয়া উঠে' (শিক্ষা)। তাই শিক্ষককে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর কর্তব্য পালন এবং শিক্ষার্থীকে শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সঙ্গে শিক্ষকের কাছ থেকে জ্ঞানার্জনের পরামর্শ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন : শান্তিনিকেতন

গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থাকে বর্জন করে রবীন্দ্রনাথ যে নতুন শিক্ষা পদ্ধতির কথা ভেবেছেন, তা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ১৯০১ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'শান্তিনিকেতন'। শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন – 'আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, এখানকার এই প্রভাতের আলো, শ্যামল প্রান্তর, গাছপালা যেন শিশুদের চিত্ত স্পর্শ করতে পারে। কারণ, প্রকৃতির সাহচর্যে তরুণ চিত্তে আনন্দ সঞ্চারের দরকার আছে এই উদ্দেশ্যে আমি আকাশ আলোর আঙ্কশায়ী উদার প্রান্তরে এই শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলুম' (শান্তিনিকেতন)। প্রাচীন ভারতীয় আশ্রমিক শিক্ষার ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ স্থাপন করেছিলেন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়। প্রাচীন আশ্রমিক শিক্ষার সব বৈশিষ্ট্যই বর্তমান ছিল শান্তিনিকেতনে। শহর ছেড়ে কেন তিনি পল্লীর উদার প্রান্তরে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কররেন, তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এভাবে–

> ভারতবর্ষের এই একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেছে, এখানকার সভ্যতার মূল প্রস্রবণ শহরে নয়, বনে। ভারতবর্ষের প্রথমতম আশ্চর্য বিকাশ যেখানে দেখতে পাই সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষ অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি করে একেবারে পিণ্ড পাকিয়ে ওঠেনি। সেখানে গাছপালা নদী সরোবর মানুষের সঙ্গে মিলে থাকবার অবকাশ পেয়েছিল। সেখানে মানুষও ছিল ফাঁকাও ছিল। ঠেলাঠেলি ছিল না। অথচ ফাঁকায় ভারতবর্ষের চিত্তকে জড়প্রায় করে দেয়নি, বরঞ্চ তার চেতনাকে আরো উজ্জ্বল করে দিয়েছিল। এরকম ঘটনা জগতে আর কোথাও ঘটেছে বলে দেখা যায় না। *(শিক্ষা)*

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবীক্ষণের মূল কথা হলো ব্যক্তিক বিকাশ এবং সামাজিক উন্নয়নের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করা। কেবল এ প্রক্রিয়ায়ই মানুষের সার্বিক মুক্তি অর্জন সম্ভব বলে তিনি মনে করেন।[১৬] অন্তঃস্থ এই প্রত্যয় থেকেই রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করেছেন শান্তিনিকেতন। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে সূত্রাকারে উপস্থাপিত হলো[১৭] –

CamScanner

১। অবাধ স্বাধীনতা : শ্রেণিকক্ষে আবদ্ধ পরিবেশে শিক্ষাদানের পরিবর্তে এখানে মুক্ত প্রকৃতির মাঝে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াতে এবং খেলাধুলা করতে পারে। অকারণ বিধি-নিষেধের কঠোরতা এখানে নেই।

২। সাম্য : জাতিধর্মের কোনো পার্থক্য এখানে করা হয় না। ছেলেমেয়েরা এক সঙ্গে পড়ালেখা করে, এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া ও খেলাধুলা করে।

৩। সরল জীবনযাপন : উচ্চ চিন্তা এবং সরল জীবনযাপন শান্তিনিকেতনের শিক্ষাপদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শিক্ষার্থীরা নিজেদের কাজ নিজেরাই করে। ঘর-বাড়ি পরিষ্কার করা, বাগান পরিচর্যা, পোষাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার করা, বাসন ধোয়া – এসব কাজ শিক্ষার্থীরা সানন্দে নিজেরাই সমাধা করে। এর ফলে তারা শ্রমের প্রতি মর্যাদা ও আত্তনির্ভরতা শেখে।

৪। গৃহ-পরিবেশ : শিক্ষার্থীরা শান্তিনিকেতনে গৃহ-পরিবেশে বাস করে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক একান্ত মধুর হওয়ার ফলে এ বিদ্যালয়ের কখনো শৃঙ্খলার অভাব দেখা দেয় না। শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে শাস্তির কঠোরতাও এখানে নেই।

৫। ভারতীয় কৃষ্টি ও আধ্যাত্মিকতা : শান্তিনিকেতনে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল ছাত্র-ছাত্রীদের ভারতীয় কৃষ্টি ও আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে শিক্ষাদান। প্রাচীন ভারতের তপোবনের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও আশ্রমিক শিক্ষাদর্শনে প্রতিফলন শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থায় সুস্পষ্ট।

৬। সহপাঠ : শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থায় সহপাঠ্যক্রমিক কাজের প্রাধান্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ঋতু উৎসব, খেলাধুলা, অভিনয়, নৃত্য, সঙ্গীত, সম্মিলন, ভ্রমণ, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে শান্তিনিকেতনের শিক্ষাক্রমে। রবীন্দ্রনাথ নিজে এইসব কাজে সক্রিয়ভাবে যোগ দিতেন, গান রচনা করতেন এবং অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতেন।

৭। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা : শান্তিনিকেতনের আর এক উল্লেখ্যযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, যথার্থ শিক্ষা কেবল মাতৃভাষার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। ঔপনিবেশিক যুগে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে এক সাহসী ও যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

৮। সময়-তালিকা ও কার্যসূচি : শান্তিনিকেতনের কাজের সময়সূচি ছিল যথেষ্ট নমনীয়। প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষার্থীদের সময়-তালিকার পরিবর্তন করা এ বিদ্যালয়ের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সাধারণভাবে ব্রাহ্মমুহূর্ত থেকে বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয় এবং সকাল দশটা পর্যন্ত পড়ালেখা চলে। মধ্যাহ্নভোজের পর বিশ্রাম। অপরাহ্নে শিক্ষার্থীরা সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রাঙ্কন, শারীরিক শিক্ষা, খেলাধুলা ইত্যাদি করে থাকে।

CamScanner

৯। শিল্প শিক্ষা: মহাত্মা গান্ধীর মতো রবীন্দ্রনাথও শান্তিনিকেতনের শিক্ষাক্রমে শিল্প কাজের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এ বিদ্যালয়ে নানারূপ কুটির শিল্প, তাঁত শিল্প, দারুশিল্প, মৃৎশিল্প, চামড়া শিল্প, কৃষি শিল্প ও উদ্যাম পরিচর্যার কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়।

১০। পল্লি-উন্নয়ন: সমাজসেবা ও পল্লি-উন্নয়নমূলক কাজ শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থার আর এক উল্লেখ্যযোগ্য বৈশিষ্ট্য। পল্লি-উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমে সমাজের নানা ধরনের মানুষের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটে, নানা বিষয়ে তারা প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারে।

১১। ভাষা শিক্ষা: রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন– 'শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ'। তাই বলে কেবল মাতৃভাষাই শিক্ষা দেওয়া হতো না শান্তিনিকেতনে। মাতৃভাষা ছাড়াও অন্যান্য ভাষা শিক্ষাকে তিনি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন। হিন্দি, উর্দু, সংস্কৃতি, পালি, প্রাকৃত, আরবি, ফারসি প্রভৃতি ভাষা শিক্ষার কথা তিনি বলেছেন। বৃহত্তর প্রাচ্য সংস্কৃতির সঙ্গে যোগস্থাপনের জন্য তিব্বতি এবং চীনা ভাষা শিক্ষার কথা তিনি বলেছেন; সর্বোপরি ইংরেজি ভাষা আয়ত্তের কথাও তিনি বলেছেন। প্রসঙ্গত তিনি লিখেছেন – 'আমি বাঙালি বলে আমাদের সাহিত্যরসের চর্চা কেবল বাংলা সাহিত্যের মধ্যেই পরিসমাপ্ত হবে? আমি কি বিশ্বসংসারে জন্মাই নি? আমারই জন্য জগতের যত দার্শনিক, যত কবি, কত বৈজ্ঞানিক তপস্যা করেছেন, এর যথার্থোপলব্ধির মধ্যে কি কম গৌরব আছে'? *(শিক্ষা)*

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কবি। শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীল কবি-প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছে। ঔপনিবেশিক শাসক-প্রবর্তিত প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শান্তিনিকেতন। এ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথের ঔপনিবেশিকতাবাদ-বিরোধী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে, তেমনি প্রকাশ ঘটেছে তাঁর সৃজনশীল শিক্ষাদর্শন, যার ভিত্তি ছিল প্রাচীন ভারতীয় আশ্রমিক শিক্ষাপদ্ধতি। প্রসঙ্গত প্রণিধানযোগ্য সমালোচকের নিম্নোক্ত বক্তব্য।

> It should therefore be clearly perceived that Santiniketan Ashram was born primarily as a protest against the conventional system of education. On the other hand, Rabindranath also had some doubts in his mind about the efficiency of our traditional indigenous institutions, such as Tol, Chatuspathi, Pathsala etc. in the field of our modern education in our country.[18]

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন : বিশ্বভারতী

পূর্বেই ব্যক্ত হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্যযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, বিশ্বাত্মচেতনা। এই বিশ্বাত্মচেতনারই বাস্তব প্রতিফলন হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত 'বিশ্বভারতী' (১৯২১)। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনার নতুন প্রয়োগক্ষেত্র হলো বিশ্বভারতী। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক উজ্জ্বল সমন্বয়ক্ষেত্র হিসেবে তিনি নির্মাণ করতে চেয়েছেন বিশ্বভারতীকে।

CamScanner

বিশ্বভারতীর উদ্বোধনী ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেন, বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মানুষ কিভাবে পরস্পর সহযোগিতা করে বাঁচতে পারে, এই প্রতিষ্ঠান থেকে তার ধারণা পাওয়া যাবে। বিশ্বভারতীর জন্য যে সংবিধান তৈরি করা হয়েছে, সেখানেই পাওয়া যায় রাবীন্দ্রিক বিশ্বাত্রবোধের পরিচয় – প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয়ই যার মূল কথা–

(a) To study the mind of Man in its realization of different aspects of truth from diverse points of view:

(b) To bring into more intimate relation with one another through patient study and research the different cultures of the East on the basis of their underlying unity.

(c) To approach the west from the standpoint of such a unity of the life and thought of Asia.

(d) To seek to realize in a common fellowship of study the meeting of East and West and thus ultimately to strengthen the fundamental conditions of world peace through the free communication of ideas between the two hemispheres;

(e) And with such ideals in view to provide at Santiniketan a centre of culture where research into the study of the religion, literature, history, science and art of Hindu, Buddhist, Jain, Zoroastrain, Islamic, Sikh, Christian, and other civilizations may be perused along with the culture of the West, with that simplicity of externals which is necessary for true spiritual realization, in amity, good fellowship and co-operation between the thinkers and scholars of both Eastern and Western countries, free from all antagonisms of race, nationality, creed or caste and in the name of the one Supreme Being who is Shantam, Shivam, Advaitam. (Visva-Bharati)

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন বিশ্বভারতী পৃথিবীর সকল জ্ঞানের সনম্বয় ঘটবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা বিশ্বভারতীতে এসে পড়ালেখা করবে – বিশ্বাত্মবোধে একাত্ম হয়ে সম্মিলনী সভ্যতার মহা অর্ণবে তারা অবগাহন করবে। এই প্রত্যয় ব্যক্ত করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন –

> 'We can work together in a common pursuit of truth, share together our common heritage, and realize that artist in all parts of the world have created forms of beauty, scientists discovered secrets of the universe, philosophers solved the problems of existence, saints made the truth of the spiritual world organic in their own lives, not merely for some particular race to which they belonged, but for mankind'. (An Eastern University).

CamScanner

১। শিশুভবন (নার্সারি স্কুল)
২। পাঠভবন (মাধ্যমিক বিদ্যালয়)
৩। শিক্ষাভবন (উচ্চ-মাধ্যমিক)
৪। বিদ্যাভবন (স্নাতক ও স্নাতকোত্তর)
৫। বিনয়ভবন (শিক্ষক-প্রশিক্ষণ)
৬। কলাভবন (শিল্প ও চারুকলা)
৭। সঙ্গীতভবন (সঙ্গীত ও নৃত্য)
৮। শ্রীনিকেতন (পল্লি-উন্নয়ন)
৯। শিক্ষাসূত্র (গ্রাম-বিদ্যালয়)
১০। শিল্পসদন (শিল্পশিক্ষণ)
১১। চীনাভবন (চীনা, তিব্বতি ইত্যাদি ভাষা-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান)।

– বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের, এইসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের যুগান্তকারী শিক্ষাদর্শন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃথিবীর সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদার্শনিক। আধুনিক ও যুযোপযোগী শিক্ষাতত্ত্বের উদ্ভাবক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ভারতের শিল্প ও কৃষ্টির সঙ্গে পাশ্চাত্যের শিল্প ও বিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর অমর শিক্ষাতত্ত্ব। তাঁর শিক্ষাভাবনার মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি যেমন দেশীয় শিক্ষারীতিকে সমকালের উপযোগী করে নিয়েছেন, তেমনি নিজের ভাবনার সঙ্গে মিলে গেলে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদদের ভাবনাকেও শিক্ষাক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছেন। সমকালীন ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তক ও শিক্ষাচর্চাবিদ হিসেবে তাঁর নাম ও কীর্তি তাই অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা সে-অর্থে যেমন মৌলিক, তেমনি অন্যদের ভাবনার সংশ্লেষ ও আত্তীকরণও বটে।[১৯] প্রসঙ্গত স্মরণীয় হিমাংশুভূষণ মুখার্জীর নিম্নোক্ত বিশ্লেষণ–

> Tagore was no more entirely 'original' than great educators like Plato, Bacon, Lacoke, Rousseau and Deway, because he reflected, as much as they, some past or contemporary thought...Tagore's educational ideas had deep and powerful roots and did not originate, as it were, in mind-air. In fact, we have made the point in an earlier context that it is one of the great merits of Tagore's educational thought that it reflected within a single compass, so much of the best educational thoughts of the world.[20]

তথ্যনির্দেশ

১। চ্যাটার্জী, সরোজ, আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের রূপায়ণ (কলকাতা: নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রা.) লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ ২০০০), পৃ. ৪৫৬।
২। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, রবীন্দ্র-সমীক্ষা (কলকাতা: দে'জ পাবলিশি, ২০০৫), পৃ.১১।
৩। পূর্বোক্ত, পৃ.১৬-১৭।
৪। ঘোষ, বিশ্বজিৎ,কথাগুচ্ছ গুচ্ছকথা (ঢাকা:গ্লোব লাইব্রেরী প্রা. লিমিটেড,২০০৩),পৃ. ২৯।

৫। হোসেন, সৈয়দ আকরম, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস: চেতনালোক ও শিল্পরূপ (ঢাকা: একুশে পাবলিকেশন্স, ২০০১), পৃ.১১।

৬। Tagore, Rabindranath,:"A Poet's School' in Pionner in Education (London: John Murray, 1961), P. 50.

৭। নন্দী, সুধীরকুমার, দর্শন-জিজ্ঞাসা (বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৫), পৃ. ৭০।

৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪।

৯। চ্যাটার্জী, সরোজ, পূর্বোক্ত (পাদটীকা নম্বর ১), পৃ. ৪৫৭।

১০। Woodrow, H., Macaulay's Minutes on Education in India (Calcutta: Co's Prees, 1862), P.115. উদ্ধৃত: বিনয় ঘোষ, বাংলার বিদ্বৎসমাজ (কলকাতা: প্রকাশ ভবন, ১৯৭৮), পৃ.৪০

১১। ঘোষ, বিশ্বজিৎ, বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ (ঢাকা : বাংলা-একাডেমী, ১৯৯৭), প.৪২।

১২। রায়, সুশীল, শিক্ষাতত্ত্ব (কলকাতা: সোমা বুক এজেন্সী, ২০০৩), পৃ. ৪১৮।

১৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তোতাকাহিনী' শীর্ষক রচনাটি বর্তমান প্রবন্ধসূত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

১৪। রায়, সুশীল, পূর্বোক্ত (পাদটীকা নম্বর ১২). পৃ. ৪২০।

১৫। চক্রবর্তী, যোগেশচন্দ্র, শিক্ষাতত্ত্বের গোড়ার কথা (কলকাতা: ঊষা পাবলিশিং হাউস, ২০০১), পৃ. ২১৪।

১৬। মাসুদুজ্জামান, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিক্ষাভাবনা (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৬), পৃ. ১০১।

১৭। সরোজ চ্যাটার্জী, পূর্বোক্ত (পাদটীকা নম্বর ১), পৃ. ৪৬০-৬১।

১৮। Tagore, Supriyo, "Rahindranath's Philosophy of Education" in Patha Bhavana: A Poet's School (Santiniketan: Visva-Bharati, 1994), P.18

১৯। মাসুদুজ্জামান, পূর্বোক্ত (পাদটীকা নম্বর ১৬), পৃ ১৩৪।

২০। Mukherjee, Himangsu Bhusan, Education for Fulness: A Study of the Educational thought and Experiment of Rabindranath Tagore (Bombay: Asia Publishing House. 1962). P. 441.

CamScanner

হিমেল বরকত*

রবীন্দ্রনাথের 'তোতা-কাহিনী' ও বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা

সারসংক্ষেপ : *বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তোতা-কাহিনী' একটি শিশুতোষ রচনা। শিশুতোষ হলেও এ গল্পের ভেতর রূপকের ছদ্মবেশে ছড়িয়ে আছে তৎকালীন ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের শিক্ষা-কাঠামোর নানামাত্রিক ত্রুটি। এর আপাত নিরীহ ভাষ্য ছাপিয়ে উৎসারিত হয়েছে নানা কৌণিক ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ– যার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ বিবৃত করেছেন তাঁর শিক্ষা-বিষয়ক পর্যবেক্ষণ এবং নির্দেশ করেছেন বিদ্যমান শিক্ষা-ব্যবস্থার অসংখ্য সীমাবদ্ধতাকে। রূপক-প্রতীকের আড়ালে উপস্থাপিত সেসব দুর্লক্ষণ এখনো আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় বহাল রয়েছে, ঔপনিবেশিক শাসনমুক্তির পরও। ফলে, রবীন্দ্রনাথের পর্যবেক্ষণ এবং শিক্ষা-সম্পর্কিত তাঁর ভাবনা আজকের দিনে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক। প্রস্তাবিত গবেষণা-প্রবন্ধটি এই উপযোগিতার আলোকে রচিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষাকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে চান নি। প্রকৃতিবিচ্ছিন্নতা ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক হয়ে ইট-পাথরের রুদ্ধ কক্ষে যে-শিক্ষা, রবীন্দ্রনাথ তাকে জীবনের শিক্ষা বলতে নারাজ। বৃহত্তর জনগোষ্ঠী, স্বজন, চারপাশের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন শিক্ষা, খাঁচাবন্দি তোতাপাখির প্রাণহীন নির্জীব শিক্ষারই সমতুল্য। 'তোতা-কাহিনী'-তে পাখিটিকে প্রকৃতি ও তার নিজস্ব আবাস থেকে কেড়ে নিয়ে খাঁচায় বদ্ধ করার পরামর্শ তাই রবীন্দ্রনাথ বিদ্রূপের সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছেন, প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি জীবনের কোল থেকে ছিন্ন করে নিষ্প্রাণ শিক্ষা-খাঁচায় আবদ্ধ করার প্রক্রিয়া। বস্তুত, এ গল্পটির আলোকে মুখস্থবিদ্যা-বিরোধী, প্রকৃতির সান্নিধ্যে শিক্ষালাভ, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কোন্নয়ন, রাষ্ট্রশক্তির ভূমিকা, শিক্ষাক্ষেত্রে বাণিজ্যিকীকরণ মনোভঙ্গির পরিত্যাগ ইত্যাদি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্য প্রস্তাবিত প্রবন্ধে উপস্থাপিত হবে। একই সঙ্গে পর্যালোচিত হবে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার সাম্প্রতিক চালচিত্র ও সীমাবদ্ধতাসমূহ। উল্লেখ্য যে, প্রস্তাবিত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-ভাবনাকে স্পষ্ট করার লক্ষ্যে 'তোতা-কাহিনী' গল্পের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-বিষয়ক অন্যান্য প্রবন্ধ ও অভিভাষণসূত্রও ব্যবহৃত হবে।*

'তোতা-কাহিনী' গল্পটি শুরুই হয়েছে শিক্ষার উপযোগিতা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাকে কটাক্ষ করে। পাখিটির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ গান গাওয়া, ওড়া, লাফানো– এগুলোই রাজার চোখে নির্দেশিত হয়েছে পাখিটির মূর্খতা হিসেবে। যেহেতু সে শাস্ত্র পড়ে না, কায়দাকানুন জানে না, তাই রাজার সিদ্ধান্ত 'এমন পাখি তো কাজে লাগে না'। উপযোগিতার এই বিবেচনা আরও পক্ষপাতী হয়ে ওঠে যখন রাজা অসন্তোষ প্রকাশ করে জানান, পাখিটি বনের ফল খেয়ে রাজহাটে ফলের বাজারে লোকসান ঘটায়। অর্থাৎ পাখিটির সহজাত প্রকাশ ও স্বভাব মনুষ্যস্বার্থের অনুকূল নয় বিবেচনা করেই রাজা পাখিটির জন্য শিক্ষার উদ্যোগ নিলেন। আপন প্রয়োজনের লক্ষ্যে অন্যের উপর শিক্ষা-আরোপের এই অভিসন্ধি ভারতবর্ষে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তির শিক্ষা-উদ্যোগের প্রসঙ্গ স্মরণ করিয়ে দেয়।

*সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা, বাংলাদেশ

CamScanner

আমরা জানি, উনিশ শতকে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনসূত্রে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। উপনিবেশ দীর্ঘস্থায়ী করার লক্ষ্যে এ-অঞ্চলে ইউরোপ-বাহিত পুঁজিতন্ত্রের যথার্থ বিকাশ ইংরেজরা আপন স্বার্থেই রোধ করেছে। ফলে পূর্বেকার সামন্তীয় ব্যবস্থার অবলেশ এবং আধা-পুঁজিতন্ত্রের মিশেলে এক অসম্পূর্ণ, অব্যবস্থিত সমাজকাঠামোই উপনিবেশকালীন ও উপনিবেশ-পরবর্তী সময়ে এ-অঞ্চলের প্রকৃত বাস্তবতা।

ঔপনিবেশিক শাসক তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও তা প্রলম্বিতকরণে ঢেলে সাজায় উপনিবেশিত অঞ্চলের শিক্ষা-কাঠামো। ইংরেজ শাসকও ভারতবর্ষে অনুরূপ কাজটি সম্পন্ন করেছে। লর্ড বেবিংটন মেকলের শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে স্পষ্টত ধরা পড়ে এদেশের শিক্ষা-কাঠামো সংস্কারে ইংরেজ-স্বার্থের অন্তর্গত অভীপ্সা। ভারতবর্ষে ইংরেজশক্তি তাদের প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে এবং তাদের অনুগত একটি সমর্থক গোষ্ঠী সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষাবিস্তারে মনোযোগী হয়। ১৮৩৫ সালে শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাবনায় টমাস বেবিংটন মেকলে স্পষ্ট ঘোষণা করেন–

> বর্তমানে আমাদের এমন একটি শ্রেণী গড়ে তুলতে হবে যারা আমাদের ও যাদেরকে আমরা শাসন করি তাদের মধ্যে দোভাষীর কাজ করবে। যারা মাংসের গড়নে ও দেহের রঙে ভারতীয় হবে বটে, কিন্তু রুচি, মতামত, নীতিবোধ ও বুদ্ধির দিক দিয়ে হবে খাঁটি ইংরেজ।[১]

অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শাসনে শিক্ষা-বিস্তারের অন্তরালে মূল লক্ষ্য হিসেবে জাগ্রত থাকে প্রশ্নহীনভাবে বিশ্বাসযোগ্য ও অনুগত এক শ্রেণির সৃষ্টি– যারা ঔপনিবেশিক আধিপত্যকে প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত হবে। মেকলের এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিলে যায় 'তোতা-কাহিনী' গল্পের রাজার উদ্দেশ্যও। অর্থাৎ যাকে শিক্ষা দেয়া হবে তার বিকাশ ও উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টিপাত না-করে, শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থকে চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে 'শিক্ষা'র মোড়কে। বলাবাহুল্য, শিক্ষার মাধ্যমে মনোজগৎ দখল এবং আধিপত্য প্রতিষ্ঠার এই পরিকল্পনার মূলে ইংরেজদের বাণিজ্য-স্বার্থই ছিল প্রধান। আজকের নব্য-ঔপনিবেশিক কালে বা বিশ্বায়নের যুগে শক্তিধর রাষ্ট্রসমূহের অন্য জাতি বা রাষ্ট্রের ভাষা-শিক্ষা-সংস্কৃতি গ্রাসের মূলেও একই প্রণোদনা ক্রিয়াশীল। এর ফলাফল যে কতটা ভয়ানক অশুভ তা গল্পের পাখিটির মৃত্যুসংবাদই প্রমাণ দেয়।

একই ভাবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার নানা রোগলক্ষণ, অসঙ্গতি ও অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিই প্রমাণ করে– আরোপিত এবং কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য পূরণের হাতিয়ার হয়ে উঠলে সে-শিক্ষা কল্যাণবাহী হতে পারে না। ১৯৪১ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য মিস রাথবোন একটা খোলা চিঠিতে অভিযোগ করেন যে, ভারতীয়রা ইংরেজের দৌলতে পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করে পুরাদস্তর উন্নতি করলেন, কিন্তু ইংল্যান্ডের বিপদের সময় তাঁরা সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন না। এই মন্তব্যের প্রতিবাদে ইংরেজিতে লিখিত রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ভারতের সব ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত হয়। তিনি লিখেছিলেন, "আমাদের সে সকল তথাকথিত ইংরেজ-বন্ধু মনে করেন যে, তাঁহারা যদি আমাদের 'শিক্ষাদান' না করিতেন তবে আমরা অজ্ঞানান্ধকারের যুগেই থাকিয়া যাইতাম, তাঁহাদের এই মনোভাব দাম্ভিক ছাড়া আর কিছুই নহে। ভারতের ব্রিটেনের সরকারী শিক্ষার প্রণালী বাহিয়া যাহা আমাদের সন্তানগণের নিকট পৌঁছিয়াছে, তাহা ব্রিটিশ ভাবধারার শ্রেষ্ঠ সম্পদ নহে।

উহার উচ্ছিষ্ট অসার অংশ। ফলে ভারতীয়রা তাহাদের নিজেদের দেশের স্বাস্থ্যকর সংস্কৃতি-সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। কিন্তু যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, ইংরেজি ভাষা ছাড়া আমাদের জ্ঞানালোক পাইবার অন্য পথ নাই, তবে সেই ইংলণ্ডীয় চিন্তাধারার উৎস হইতে আকণ্ঠ পান করিবার ফলে, দুই শতাব্দীব্যাপী ব্রিটিশ শাসনের পর ১৯৩১ সালে আমরা দেখিতে পাই ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা মাত্র একজন ইংরেজি ভাষায় লিখন পঠনক্ষম হইয়াছে। অন্য দিকে রাশিয়ার মাত্র পনেরো বৎসরের সোভিয়েট শাসনের ফলে ১৯৩৯ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নে শতকরা ৯৮টি বালক-বালিকা শিক্ষালাভ করিয়াছে। (এই সংখ্যাগুলি ইংরেজ-প্রকাশিত 'স্টেটসম্যান্স ইয়ার বুক' হইতে উদ্ধৃত। ঐ বহির রাশিয়ার অনুকূলে পক্ষপাতভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।)"[২]

অথচ প্রাচীন ভারতের যে শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা আমরা জানি, তার সুনাম সেকালে ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। বস্তুত, প্রাচীন ভারতে আর্যদের আগমনের (খ্রিস্টপূর্ব ১০০০-এর পূর্বে) পর, তাদের ভেতর শিক্ষাদান ও গ্রহণের যে-ব্যবস্থাটি ছিল, তা-ই কালক্রমে এ অঞ্চলে প্রসারিত ও বিকশিত হয়। পুরোহিতরাই ছিলেন আর্য-ধর্ম ও সংস্কৃতির বাহক। আর্যদের ধর্মগ্রন্থ বেদকে ঘিরেই সেকালে সূচনা হয় ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা। বেদজ্ঞ ঋষিরাই ছিলেন প্রথম স্তরের শিক্ষক। বেদ-বিদ্যা লাভ করে ঋষিদের ন্যায় প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য অন্যেরা ঋষিগৃহে সমবেত হতেন। ঋষি-পরিবারই ছিল আদি বৈদিক যুগের 'গুরুকুল'। ঋষিগৃহে থেকেই পুরোহিতদের মধ্যে প্রথম বেদ-বিদ্যার প্রসার হয়। কালক্রমে, বৈদিক যুগের উপাসনা-পদ্ধতি, যাগযজ্ঞের ক্রিয়াকাণ্ড বৃদ্ধির সঙ্গে বেদ-বিদ্যা ও ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাও প্রসারিত হয়। পাশাপাশি ব্যবহারিক শিক্ষার অনুকূল বিষয় শিক্ষার প্রবণতাও বৃদ্ধি পায়।[৩] উল্লেখ্য যে, আদি বৈদিক যুগে সমাজে বর্ণ-বৈষম্য সৃষ্টি হলেও (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) তা ছিল মূখ্যত কর্মগত। তাই শ্রেণিবিভাজনের রীতি-নীতি তখনও জটিল, কঠিন ও অপরিবর্তনীয় ছিল না। তৎকালীন ঋষি এবং সাধু-সন্ন্যাসীদের যে ব্রাহ্মণ হতেই হবে এমন কোনো সুদৃঢ় জন্মভিত্তিক রীতি তখনও প্রবর্তিত হয় নি। সেকালে তপস্যার মাধ্যমে বহু নরপতি (ক্ষত্রিয়) ঋষির মর্যাদা পেয়েছিলেন। নারীরাও সে যুগে যাগ-যজ্ঞাদির প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারতেন। ঋকবেদের মতে অনার্যরাও তখন শিক্ষালাভের অধিকারী ছিলেন।

সেকালের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল ঋষি বা গুরুর গৃহে। তপোবনের শান্ত নির্জন পরিবেশে ঋষির কুটির ছিল শিক্ষালয়ের আদিম রূপ। উপনয়নের মত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিষ্যরা ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রবেশের অনুমতি লাভ করত। আচার্যের কুটিরে গুরু-শিষ্য ঠিক পিতাপুত্রের মতো নিবিড় স্নেহ-সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে বসবাস ও বিদ্যাচর্চা করতেন। গুরুগৃহে গুরুই শিক্ষার্থীর ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতেন। শিক্ষার্থী শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর গুরুদক্ষিণা প্রদান করত। এসময় বেতনভুক্ত শিক্ষক সমাজে নিন্দিত হতেন। গুরুর প্রথম কর্তব্য ছিল শিষ্যকে পুত্রবৎ স্নেহে পালন করা এবং শিষ্যের সুশিক্ষা দানই ছিল গুরুর ধর্মীয় কর্তব্য। শিষ্যকে জ্ঞানরাজ্যের সর্বস্ব দান করাই ছিল গুরুর মানসিক উদারতা। গুরুকে হতে হতো নিষ্ঠাবান, চরিত্রবান, সুপণ্ডিত, স্নেহপ্রবণ, ত্যাগী। অর্থ ও সম্মানের আশা ত্যাগ করে নিষ্ঠার সঙ্গে আত্মোৎসর্গী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শিক্ষাদানের জন্য গুরু ছিলেন সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ পূজনীয় ব্যক্তি। গুরু কেবল শিক্ষার্থীকে ধর্ম-শিক্ষাই প্রদান করতেন না, প্রকৃতির অপার সান্নিধ্যে প্রকৃত মানুষের গুণাবলিও শিষ্যের মাঝে সঞ্চারিত করতেন।

CamScanner

অর্থাৎ এখানেই শিক্ষার্থী লাভ করত দ্বিতীয় জন্ম। গুরুর শিক্ষালাভের জন্য শিক্ষার্থীরও ছিল কিছু অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। গুরুর গৃহে ভর্তির যোগ্যতা বিচারে ছিল শিক্ষার্থীর নৈতিক চরিত্র ও বাঞ্ছনীয় আচার-আচরণ। নৈতিকতার বিচারে হীন প্রতিপন্ন হলে গুরুর গৃহে তার স্থান হতো না। সেকালে ছাত্রদের ব্রহ্মচর্য পালন ছিল বাধ্যতামূলক। পাশাপাশি আবাসিক ছাত্র হিসেবে গুরুর সেবা ও তার পরিবারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সহায়তা করতে হতো। অর্থাৎ সেকালে আশ্রমবাসী গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক ছিল পিতা ও সন্তানের তুল্য। শ্রদ্ধা ও স্নেহের এই সম্পর্ক বন্ধনের ভেতর দিয়েই সম্পন্ন হতো শিক্ষা কার্যক্রম।

কালক্রমে বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা আরও পরিণত ও প্রসারিত হয়েছে। ধর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে বৃত্তিমূলক শিক্ষা, যেমন : অঙ্কশাস্ত্র, নক্ষত্রবিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র, সর্ববিদ্যা, রাজনীতি ও অর্থশাস্ত্র, সঙ্গীত, শিল্প, কলা, নাট্যশাস্ত্র, স্থাপত্যবিদ্যা, ইতিহাস-পুরাণ, ব্যাকরণ প্রভৃতি। সেই সঙ্গে গড়ে উঠেছে বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ– নালন্দা, তক্ষশিলা, বিক্রমশীলা, বলবী, ওদন্তপুরী, মিথিলা, নবদ্বীপ শিক্ষাকেন্দ্র। জানা যায়, হিউয়েন সাঙের সময় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ হাজার আবাসিক শিক্ষার্থী ছিলেন। এদের সবার ভরণপোষণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই প্রদান করা হতো। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এখানে ভর্তি হতে শিক্ষার্থীরা ছুটে আসতেন।[৪] কিন্তু ভারতবর্ষের এই গৌরবান্বিত শিক্ষাব্যবস্থা ধসে পড়ে শাসককুলের পরিবর্তনের মাধ্যমে। সবচেয়ে বড় আঘাতটি আসে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তির রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর। ভিনদেশি শিক্ষাব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়ার ফলে এ অঞ্চলে শিক্ষার আমূল পরিবর্তন সংঘটিত হয়ে।

ইংরেজ ঔপনিবেশিক কালে স্থাপিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অযৌক্তিকভাবে অধিক অর্থে শিক্ষা গ্রহণ করার ব্যবস্থা চালু করা হয়। যার লক্ষ্য ছিল– উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের সন্তানরাই এই শিক্ষা গ্রহণে সক্ষম হবে এবং গড়ে উঠবে ইংরেজ ভাবধারায় ও আদর্শে। এসব প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত শিক্ষা এদেশীয় বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনে জীবন যোগের মাধ্যম হয়ে ওঠে নি, বরং শিক্ষার অহমিকা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দৌরাত্ম্যে ক্রমশ ব্যবধানের মাত্রা সম্প্রসারিত হয়েছে। ঔপনিবেশিক শিক্ষা কাঠামোর এই ত্রুটি সেকালে রবীন্দ্রনাথ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। 'শিক্ষার বিকিরণ' প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন– 'আমাদের দেশে প্রচলিত বিদ্যা প্রবাসিনী আধুনিকী বিদ্যা। তার আছে বিশিষ্ট রূপ, সাধারণ রূপ নেই। সেইজন্য ইংরেজি শিখে যাঁরা বিশিষ্টতা পেয়েছেন তাঁদের মনের মিল হয় না সর্বসাধারণের সঙ্গে। দেশে সকলের চেয়ে বড় জাতিভেদ এইখানেই– শ্রেনিতে অস্পৃশ্যতা।' অন্যত্র তিনি আরও স্পষ্ট করেছেন ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্মূলতাকে–

> সকল দেশেই শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীণ জীবনযাত্রার যোগ আছে। আমাদের দেশে কেবলমাত্র কেরানিগিরি ওকালতি ডাক্তারি ডেপুটিগিরি দারোগাগিরি মুন্সেফ প্রভৃতি ভদ্রসমাজে প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসায়ের সঙ্গেই আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ যোগ। যেখানে চাষ হইতেছে, কলুর ঘানি ও কুমারের চাক ঘুরিতেছে, সেখানে এ শিক্ষার কোন স্পর্শও পৌঁছায় নাই। অন্য কোনো শিক্ষিত দেশে এমন দুর্যোগ ঘটিতে দেখা যায় না। তাহার কারণ, আমাদের নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের মাটির উপরে নাই, তাহা পরগাছার মতো পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলিতেছে।[৫]

CamScanner

সেকালের শিক্ষা-ব্যবস্থা ও তার ফল সম্পর্কে ১৮৭৫ সালে 'হিন্দুরঞ্জিকা' পত্রিকা লিখেছিল :

> ইংরেজী শিক্ষার ফলে নেটিভরা হয়ে উঠেছে বিলাসী এবং সব জিনিসের জন্য এমনকি নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র, যেমন কাগজ, কলম প্রভৃতির জন্যেও হয়ে উঠছে ইংরেজদের উপর নির্ভরশীল। এখনও তারা এগুলি উৎপাদন করতে শেখেনি। তাদের আগ্রহ আছে শুধু চাকরিতে; কিন্তু চাকুরির বাজারেও মন্দা। এ দুর্দশার কারণ বিবিধ– এক. ইংরেজী শিক্ষার ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা, দুই. দূরদর্শিতা এবং উদ্যমের অভাব। আমাদের স্কুলগুলিতে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়, কোন একটি বিশেষ ব্যাপারে জোর দেয়া হয় না। দেশীয়দের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে অনুৎপাদনশীল ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থা।[৬]

শিক্ষাকে পুঁজির সঙ্গে একাত্ম করে সার্থক বিনিয়োগ হিসেবে দেখার চোখ তৈরি হয়েছিল ঔপনিবেশিক কালে। 'লেখাপড়া করে যে/ গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে'– এই প্রবাদের অন্তরালে লুকিয়ে আছে সেই বিনিয়োগের স্বপ্নমন্ত্র। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পেশাজীবী শ্রেণিও এভাবে তৈরি হয়েছিল ইংরেজ আমলে। যাদের একান্ত আনুগত্য প্রকাশিত হয়েছে সেকালে ইংরেজ প্রশাসনের প্রতি, স্বীয় অস্তিত্বের তাগিদে। সেই সঙ্গে তারা মর্যাদা, আভিজাত্য আর কর্তৃত্বের অহমিকায় 'অপর' করে রেখেছে শ্রমজীবী মানুষকে। কায়িক শ্রমকে অবহেলা আর অমর্যাদার চোখে দেখার সেই ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি লুপ্ত হয় নি আজো। ঔপনিবেশিক কালে শিক্ষার মূল লক্ষ্যই ছিল চাকরি লাভ। চাকরি লাভ অর্থাৎ আর্থিক নিরাপত্তাকে শিক্ষা অর্জনের মুখ্য কারণ হিসেবে যেমন সেকালে দেখা হয়েছিল, তেমনি সামাজিক মর্যাদা ও আভিজাত্যের সূচকও হয়ে ওঠে প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি। এই মূল্যবোধ ক্রমাগত আরও দৃঢ়মূল ও বিস্তারিত হয়েছে। একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের শিক্ষাকাঠামোর যে-আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন ছিল, তা অদ্যাবধি সম্পন্ন হয় নি। ফলে, ঔপনিবেশিক শিক্ষাকাঠামোর আদলে পরিচালিত হচ্ছে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোতে চাকরির জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ছে সদ্য পাশ করা ঝাঁকে-ঝাঁকে তরুণ। তাদের এই স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইংরেজি মাধ্যমে শত শত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি বা বিদেশ-গমনের স্বপ্নপূরণের পাশাপাশি এসব প্রতিষ্ঠান আভিজাত্যের নির্দেশকেও পরিণত হয়েছে। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সন্তানকে পড়াবার জন্য মাত্রাতিরিক্ত অর্থব্যয়েও কার্পণ্য করছে না উচ্চবিত্ত শ্রেণি। এমনকি মধ্যবিত্ত শ্রেণিও উপার্জনের সর্বস্ব বিনিয়োগ করে নেমে পড়ছে আভিজাত্য প্রদর্শনের এই প্রতিযোগিতায়। এভাবে, শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে চলেছি আমরা।

'তোতা-কাহিনী' গল্পে রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির অসারতাকেও নির্দেশ করেছেন। গল্পে দেখতে পাই, রাজপণ্ডিতেরা পাখিটির 'অবিদ্যা'র কারণ অনুসন্ধান ও তা উত্তরণের সমাধান খুঁজতে ব্যাকুল। শেষে তারা সিদ্ধান্ত নিলেন, 'সামান্য খড়কুটা দিয়া পাখি যে বাসা বাঁধে সে বাসায় বিদ্যা বেশি ধরে না। তাই সকলের আগে দরকার, ভালো করিয়া খাঁচা বানাইয়া দেওয়া।' অর্থাৎ পাখির শিক্ষার জন্য প্রকৃতির অবাধ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে খাঁচা-বন্দী পরিবেশ-নির্মাণের পক্ষে মত দিলেন রাজপণ্ডিতেরা। বলাবাহুল্য, অদ্যাবধি আমাদের প্রচলিত শিক্ষা কাঠামো এই আবদ্ধকরণ ও প্রকৃতিবিচ্ছিন্নতার স্রোতেই বহমান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষাকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে চান নি। প্রকৃতিবিচ্ছিন্নতা ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক হয়ে ইট-পাথরের রুদ্ধ কক্ষে যে-শিক্ষা, রবীন্দ্রনাথ তাকে জীবনের শিক্ষা বলতে নারাজ।

CamScanner

১৩২৯ সালের ভাদ্র-আশ্বিনের শান্তিনিকেতন পত্রিকায় তিনি জানান, 'প্রকৃতির বক্ষ থেকে, মানবজীবন সংস্পর্শ থেকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে শিশুকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলে ফেলা হয়।–প্রাণের সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই যে-বিদ্যা লাভ করা যায় এটা কখনও জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারে না।'[৭] প্রচলিত স্কুল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবও তাই নেতিবাচক। 'শিক্ষা সমস্যা' (১৩১৩) প্রবন্ধে স্কুলের পাঠ-পদ্ধতিকে যান্ত্রিক কাঠামো অভিহিত করে তিনি লিখেছেন, 'ইস্কুল বলিতে আমরা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাস্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাস্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাস্টার-কলও তখন মুখ বন্ধ করেন; ছাত্ররা দুই-চার পাত কলে-ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে।'[৮]

কেবল প্রকৃতি থেকে নয়, বৃহত্তর জনগোষ্ঠী, স্বজন, চারপাশের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন শিক্ষা, খাঁচাবন্দী তোতাপাখির প্রাণহীন নির্জীব শিক্ষারই সমতুল্য। 'তোতা-কাহিনী'-তে পাখিটিকে প্রকৃতি ও তার নিজস্ব আবাস থেকে কেড়ে নিয়ে খাঁচায় বদ্ধ করার পরামর্শ তাই রবীন্দ্রনাথ তীব্র বিদ্রূপের সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করেছেন, প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি জীবনের কোল থেকে ছিন্ন করে নিষ্প্রাণ শিক্ষা-খাঁচায় আবদ্ধ করার প্রক্রিয়া। জীবন ও পারপার্শ্বিকতা থেকে বিচ্যুত এই শিক্ষার ফলাফল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র লিখেছেন :

> বিদ্যালয় যেখানে চারিদিকের সমাজের সঙ্গে এমন এক হইয়া মিশিতে পারে নাই– যাহা বাহির হইতে সমাজের উপর চাপাইয়া দেওয়া তাহা শুষ্ক, তাহা নির্জীব, তাহার কাছ হইতে যাহা পাই তাহা কষ্টে পাই এবং সে বিদ্যা প্রয়োগ করিবার বেলা কোনো সুবিধা করিয়া উঠিতে পারি না। দশটা হইতে চারটে পর্যন্ত যাহা মুখস্থ করি, জীবনের সঙ্গে, চারিদিকের মানুষের সঙ্গে, ঘরের সঙ্গে তাহার মিল দেখিতে পাই না। বাড়িতে বাপ মা ভাই বন্ধুরা যাহা আলোচনা করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে তাহার যোগ নাই, বরঞ্চ অনেক সময়ে বিরোধ আছে। এমন অবস্থায় বিদ্যালয় একটি এঞ্জিন মাত্র হইয়া থাকে, তাহা বস্তু জোগায়, প্রাণ জোগায় না।[৯]

প্রচলিত শিক্ষা-কাঠামোর ত্রুটি ও অসারতাকে চিহ্নিত করেই রবীন্দ্রনাথ নিরস্ত হন নি। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায়ও তিনি ভেবেছেন। সবচেয়ে বড় কথা, নিজের শিক্ষাভাবনাকে তিনি বাস্তবে প্রয়োগ করারও উদ্যোগ নিয়েছেন। ১৯০১ সালে প্রতিষ্ঠিত 'শান্তিনিকেতন' সেই উদ্যমেরই ফল। সেখানে প্রাচীন ভারতের তপোবনের মতো উন্মুক্ত শিক্ষা-পরিবেশ তিনি নির্মাণ করতে চেয়েছেন।

প্রচলিত পাঠদান পদ্ধতিতেও আস্থা রাখতে পারেন নি রবীন্দ্রনাথ। পুঁথিসর্বস্ব বিদ্যা ও তা আয়ত্ত করার অর্থাৎ মুখস্থকরণ প্রক্রিয়াকে শিক্ষার যথার্থ পথ বলে তিনি স্বীকার করেন নি। 'তোতা-কাহিনী' গল্পে প্রচলিত এই ব্যবস্থাকে বিদ্রূপের সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন তিনি। গল্পে দেখতে পাই, পাখিটির শিক্ষা-প্রদানের শুরুতেই পণ্ডিত "নস্য লইয়া বলিলেন, 'অল্প পুঁথির কর্ম নয়।' ভাগিনা তখন পুঁথিলিখকদের তলব করিলেন। তারা পুঁথির নকল করিয়া এবং নকলের নকল করিয়া পর্বতপ্রমাণ করিয়া তুলিল। যে দেখিল সেই বলিল, 'সাবাস! বিদ্যা আর ধরে না।" পুঁথির এই সাড়ম্বর আয়োজনের পাশাপাশি চলল পুঁথি-গেলানোর মর্মান্তিক উদ্যম– 'খাঁচায় দানা নাই, পানি নাই; কেবল রাশি রাশি পুঁথি হইতে রাশি রাশি পাতা ছিঁড়িয়া কলমের ডগা দিয়া পাখির মুখের মধ্যে ঠাসা হইতেছে। গান তো বন্ধই, চিৎকার করিবার ফাঁকটুকু পর্যন্ত বোজা।

CamScanner

দেখিলে শরীরে রোমাঞ্চ হয়।'[১০] বলা বাহুল্য, পাখির বিদ্যা-শিক্ষার এই রোমাঞ্চিত আয়োজন, আমাদের প্রচলিত শিক্ষণ পদ্ধতিরই মূর্ত চিত্র। বস্তুত, পাখিটির শিক্ষাদান-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ তিনটি বিষয়কে সামনে নিয়ে এসেছেন– পুঁথিসর্বস্ব শিক্ষা, জোরপূর্বক মুখস্থকরণ ও শিক্ষায় মাতৃভাষাকে উপেক্ষা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে শিক্ষার মৌল উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীর জীবনের সব প্রান্তকে স্পর্শ করে এমন পাঠক্রম রচিত হওয়া উচিত। তিনি পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামনে সংস্কৃতির পরিপূর্ণ রূপটি তুলে ধরতে চেয়েছেন। তাই, তিনি পাঠক্রমে সেই সব বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিত্তে মানবসংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি হয়। তিনি তাঁর প্রস্তাবিত পাঠক্রমের মধ্যে ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সঙ্গীত, নৃত্য, পরিবেশ, পল্লি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, কুটির শিল্প এবং বেশ কিছু সামাজিক কাজকে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন।[১১] এভাবে, রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত পাঠক্রম শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশেরই সহায়ক। তাঁর শিক্ষাক্রম শিক্ষার্থীকে রাশি-রাশি পুঁথি ও তা মুখস্থের ভারে তোতাপাখির করুণ পরিণতির দিকে ঠেলে দেয় না, বরং শিক্ষার্থীকে করে তোলে জীবনমুখী, স্বপ্নমুখী ও মানবমুখী।

পুঁথিসর্বস্ব শিক্ষা ও মুখস্থ বিদ্যাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষা-বিষয়ক নানা প্রবন্ধেও তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন ভ্রমণের প্রতি, প্রকৃতি ও জীবনের সংযোগের মাধ্যমে অর্জিত শিক্ষার প্রতি। তাঁর ভাষায়–

> আমার মতে শিক্ষার প্রণালী হচ্ছে বৈরাগীর রাস্তায়। ছাত্রদের নিয়ে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়। চলতে চলতে নিয়ত নব নব বিস্ময়ে অজানার ভিতর দিয়ে জেনে চলাই হচ্ছে প্রাণবান শিক্ষা। প্রাণের ছন্দের সঙ্গে এই শিক্ষা প্রবাহের তাল মেলে। বদ্ধ ক্লাস হচ্ছে প্রাণধর্মী চিত্তের সহজজ্ঞানের পথে কঠিন বাধা। খাঁচার মধ্যে পাখিকে বাঁধাখোরাক খাওয়ানো যায়, কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ পাখি হতে শেখানো যায় না। বনের পাখি ওড়ার সঙ্গে খাওয়ার মিল করে আনন্দিত হয়। প্রকৃতির অভিপ্রায় ছিল চলার সঙ্গে পাওয়ার মিল করে মানুষকে শেখানো।[১২]

আর একারণেই শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল, বাঙালির ছেলেরা এখানে মানুষ হবে– রূপে, রসে, গন্ধে, বর্ণে, চিত্রে, সঙ্গীতে তাদের হৃদয় শতদল পদ্মের মতো আনন্দে বিকশিত হয়ে উঠবে। এই আকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি মুখস্থ বিদ্যার প্রতি রবীন্দ্রনাথের ছিল তীব্র বিরূপ মনোভাব। তাঁর নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেই বিরূপতা–

> মুখস্থ করিয়া পাস করাই তো চৌর্যবৃত্তি। যে ছেলে পরীক্ষামালায় গোপনে বই লইয়া যায় তাকে দেখাইয়া দেওয়া হয়; আর যে ছেলে তার চেয়েও লুকাইয়া লয়, অর্থাৎ চাদরের মধ্যে না লইয়া মগজের মধ্যে লইয়া যায়, সেই বা কম কী করিল? সভ্যতার নিয়ম অনুসারে মানুষের স্মরণশক্তির মহলটা ছাপাখানায় অধিকার করিয়াছে। অতএব, যারা বই মুখস্থ করিয়া পাস করে তারা অসভ্যরকমে চুরি করে, অথচ সভ্যতার যুগে পুরস্কার পাইবে তারাই?[১৩]

এই মুখস্থ বিদ্যা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এমনই সুদূরপ্রসারী প্রভাব জিইয়ে রেখেছে যে, এর পৃষ্ঠপোষকরূপে রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছিলেন অভিভাবকদের। তাঁর মতে, 'জানি, এর প্রধান অন্তরায় অভিভাবক; পড়া মুখস্থ করতে করতে জীবনীশক্তি মননশক্তি কর্মশক্তি সমস্ত যতই কৃশ হতে থাকে তাতে বাধা দিতে গেলে তাঁরা উদ্‌বিগ্ন হয়ে ওঠেন। কিন্তু মুখস্থ বিদ্যার চাপে এই-সব চিরপঙ্গু মানুষের অকর্মণ্যতার বোঝা দেশ বহন করবে কী করে?'[১৪]

আশার কথা, সম্প্রতি বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে) মুখস্থবিদ্যার গুরুত্ব হ্রাস করে শিক্ষার্থীর অনুধাবনশক্তি, বিশ্লেষণশক্তি ও সৃজনশীলতাকে প্রাধান্য দেওয়ার লক্ষ্যে 'সৃজনশীল পদ্ধতি'র প্রচলন করা হয়েছে। পদ্ধতিটি শিক্ষার্থীদের প্রকৃত বিকাশের অনুকূল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এমন বড় ধরনের একটি পরিবর্তন শিক্ষাব্যবস্থায় ফলপ্রসূ করার জন্য শিক্ষকদের যে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ছিল, তা যথার্থভাবে সম্পন্ন হয় নি। ফলে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষার্থীরা তো বটেই, অনেক স্থানে শিক্ষকরাও 'সৃজনশীল পদ্ধতি' সম্পর্কে স্পষ্ট নন। প্রশ্ন করার জন্য তারা দ্বারস্থ হচ্ছেন বাজারে প্রচলিত নোট বইয়ের। শিক্ষার্থীরাও অনুসরণ করছে নোট বই। ফলে এই ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হচ্ছে। নম্বরপ্রাপ্তির লক্ষ্যে শিক্ষার্থীরা মুখস্থবিদ্যার জালেই বন্দী হয়ে রয়েছে। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে 'সৃজনশীল পদ্ধতি' নিয়ে তেমন কোনো ভাবনার প্রয়োগ লক্ষ করা যাচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরীক্ষা ও মূল্যায়ন-পদ্ধতি সেই ঔপনিবেশিক আমলের কাঠামো থেকে বের হতে পারে নি। ফলে এখানেও মুখস্থবিদ্যার জয়জয়কার।

শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে রবীন্দ্রনাথ সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন মাতৃভাষাকে। 'তোতা-কাহিনী'র পাখিটির মাতৃভাষা– গান। বিভাষী পুঁথির গলাধঃকরণে তার গান রুদ্ধ হয়েছে, এমনকি চিৎকার করে প্রতিবাদ জানানোর শক্তিও লুপ্ত হয়েছে। পরভাষায় শিক্ষাদানের ফল এমনই ভয়াবহ। ইংরেজশক্তির প্রচেষ্টায় ঔপনিবেশিক কালে ভারতবর্ষে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষাদানের যে-রেওয়াজ তৈরি হয়েছিল, বর্তমান বাংলাদেশে ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের পরও সেই একই চিত্র বিদ্যমান। উপযোগিতার দোহাই ছাড়াও সেকালের ইংরেজি ভাষা জানার আভিজাত্য-প্রদর্শন একালেও ক্রিয়াশীল। ঢাকার অলিতে-গলিতে গড়ে উঠেছে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়। কেবল রাজধানী ঢাকা নয়, দেশের বিভিন্ন জেলাতেও এখন ক্রমশ বাড়ছে ইংরেজি শিক্ষামাধ্যম। এদেশের অভিভাবকশ্রেণিও গৌরবান্বিত বোধ করেন এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সন্তানকে ভর্তি করিয়ে। অথচ, শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বরাবরই রবীন্দ্রনাথ গুরুত্ব দিয়েছেন মাতৃভাষার উপর। শৈশবে ভিন্ন ভাষায় শিক্ষা লাভের ফলে ভাব ও ভাষার প্রকৃত সেতুবন্ধন গড়ে ওঠে না। এর করুণ পরিণতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন–

> আমাদের বাল্যকালের শিক্ষায় আমরা ভাষার সহিত ভাব পাই না, আবার বয়স হইলে ঠিক তাহার বিপরীত ঘটে, যখন ভাব জুটিতে থাকে তখন ভাষা পাওয়া যায় না। .... ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাবশিক্ষা একত্র অবিচ্ছেদ্যভাবে বৃদ্ধি পায় না বলিয়াই য়ুরোপীয় ভাবের যথার্থ নিকট সংসর্গ আমরা লাভ করি না এবং সেইজন্যই আজকাল আমাদের অনেক শিক্ষিত লোক য়ুরোপীয় ভাবসকলের প্রতি অনাদর প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অন্যদিকেও তেমনই ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই মাতৃভাষা হইতে তাঁহারা দূরে পড়িয়া গেছেন এবং মাতৃভাষার প্রতি তাঁহাদের একটি অবজ্ঞা জন্মিয়া গেছে।[১৫]

বাংলাদেশে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলার প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর তৎপরতাও চোখে পড়ে না। বিশেষ করে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক অনুবাদ বা বাংলায় রচনা করে সর্বস্তরে বাংলা ভাষাকে ছড়িয়ে দেয়া যেতে পারত। কিন্তু স্বাধীনতার ৪৫ বছর পরও এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ভীষণ হতাশাজনক। ফলে, হাতে গোনা দু-একটি বিভাগ বাদে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অন্যসব বিভাগে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার জন্য নির্ভর করতে হয় ইংরেজি ভাষায় রচিত মূল ও রেফারেন্স গ্রন্থের ওপর।

CamScanner

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'তোতা-কাহিনী' গল্পে শিক্ষাবিস্তারে রাষ্ট্রশক্তির আড়ম্বরপ্রিয়তা ও তার অসারতাকে তীব্র শ্লেষের সঙ্গে বারম্বার চিত্রিত করেছেন। গল্পে আমরা দেখতে পাই, একটি পাখির শিক্ষার জন্য বিভিন্ন পেশাজীবীর বহু মানুষের সন্নিবেশ। পাখিটির শিক্ষা তদারকির জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়েছে রাজার ভাগিনাকে। বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্বজনপ্রীতির এ নিদর্শন নিঃসন্দেহে আরও আশঙ্কাজনক। এরপর পাখিটির মূর্খতার কারণ সন্ধানে জড়ো করা হয়েছে রাজপণ্ডিতদের, প্রচলিত ভাষায় যার নাম 'শিক্ষা কমিশন'। 'শিক্ষা কমিশনে'র পরামর্শে সোনার খাঁচা (স্কুল ঘর) নির্মাণে নিযুক্ত হয়েছে স্যাকরা। অতঃপর পণ্ডিত এলেন পাখিটিকে শিক্ষা দিতে। যেহেতু প্রচুর পুঁথির প্রয়োজন, ফলে তলব করা হলো পুঁথি-লেখকদের। পাখিটির শিক্ষার জন্য নির্মিত হয়েছিল সোনার খাঁচা। এবার সেই খাঁচার মেরামত, ঝাড়া-মোছা-পালিশের জন্য প্রয়োজন পড়ল 'বিস্তর লোক'। তারা কাজে ফাঁকি দিচ্ছে কি-না, তা তদারকির জন্য লোক নিযুক্ত হলো 'আরও বিস্তর'। বলাবাহুল্য, আজকের দিনে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের এই অপচয় ও অসার আয়োজন আমরা প্রতিনিয়ত লক্ষ করছি।

গল্পের শেষাংশে পাই, আধ-মরা অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ পাখিটিকে শায়েস্তা করার জন্য শিক্ষামহলে হাপর হাতুড়ি আগুন নিয়ে হাজির হয়েছে কামার। লোহার শিকল তৈরি হলো, পাখির ডানাও কাটা হলো। সবশেষে, মৃত পাখির রাজপ্রাসাদে আগমনও আড়ম্বরতায় পূর্ণ– 'পাখি আসিল। সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়সওয়ার আসিল।' ক্ষুদ্র একটি পাখির শিক্ষা নিয়ে এতো আয়োজন, আড়ম্বরতা ও অপচয়কে অতিরঞ্জন মনে হতে পারে। কিন্তু আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও তার ফল পর্যালোচনা করলে গল্পের অতিরঞ্জনটাই বাস্তব সত্য রূপে প্রতিভাত হয়।

লক্ষণীয়, পাখিটির শিক্ষা কার্যক্রম কীভাবে সম্পন্ন হচ্ছে তা স্বচক্ষে দেখার জন্য রাজা একবার শিক্ষাশালায় আগমন করেন। রাজাকে স্বাগত জানাতে বেজে উঠল শাঁখ-ঘণ্টা-ঢাক-ঢোল ইত্যাদি। পণ্ডিত, মিস্ত্রি, মজুর, স্যাকরা, লিপিকর, তদারকনবিশ সকলে জয়ধ্বনি তুলল। এমন জাঁকজমক অভিবাদনে রাজা ভুলেই গেলেন পাখিটিকে দেখবার কথা। ফেরার পথে নিন্দুক মনে করিয়ে দেওয়ার পর, রাজা আবার ফিরলেন শিক্ষাশালায়। পাখিকে কীভাবে শেখানো হয়, তার কায়দাটা রাজা দেখতে চাইলেন। দেখাও হলো। তিনি 'দেখিয়া বড় খুশি। কায়দাটা পাখিটার চেয়ে এত বেশি বড় যে, পাখিটাকে দেখাই যায় না; মনে হয় তাকে না দেখিলেও চলে। রাজা বুঝিলেন, আয়োজনের ত্রুটি নাই।'[১৬] উদ্দেশ্যের চেয়ে আড়ম্বরতা যখন বড় হয়ে ওঠে, তখনই এমন দৃষ্টিবিভ্রম উপস্থিত হয়। শিক্ষার চেয়ে আনুষঙ্গিক আয়োজনই রাজার কাছে বড় মনে হয়েছে, আর এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিণাম বহন করতে হয়েছে পাখিটিকে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে।

আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায়ও উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও ফলের কোনো পারম্পর্য নেই। শাসকগোষ্ঠী ও তাদের অনুগত শ্রেণির স্বার্থসিদ্ধিই হয়ে উঠছে সকল উদ্যোগের অন্তিম প্রেরণা। ফলে 'দারিদ্র বিমোচনে শিক্ষা' 'কর্মমুখী শিক্ষা', 'অবৈতনিক শিক্ষা', 'দারিদ্রদের উপবৃত্তি প্রদান' সকল উদ্যোগের ফল শেষাবধি হতাশাজনক। কেবল, তাদের জন্যই লাভজনক হয়ে উঠছে এসব নানামুখী আয়োজন, যারা রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে কোনো-না-কোনো সূত্রে জড়িয়ে আছে। 'তোতা-কাহিনী' গল্পেও রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন পাখির শিক্ষাকে কেন্দ্র করে কত জনের সোনার হার, শিরোপা অর্জনের পাশাপাশি 'সিন্দুক বোঝাই' হলো।

সন্দেহ নেই, ধাপে-ধাপে চোখে আঙুল দিয়ে প্রাপ্তিযোগের বিষয়টি এতবার দেখিয়ে দেওয়ার অর্থ-শিক্ষার উদ্দেশ্য থেকে কীভাবে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ভিন্নপথে ধাবিত হয়, তাকে স্পষ্ট করা। রবীন্দ্রনাথ সেকালে যেমন এই অপচক্রকে অনুধাবন করেছিলেন, আজকের দিনে আমরা তা হাড়ে-হাড়ে উপলব্ধি করছি। বলা বাহুল্য, রাষ্ট্রশক্তির শুভবোধের বিকাশ ও তার প্রয়োগ ছাড়া এই দুর্লক্ষণ নিরাময়ের উপায় নেই।

'তোতা-কাহিনী' গল্পে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক নিয়েও রবীন্দ্রনাথের ভাবনার প্রচ্ছন্ন পরিচয় মেলে। বিপুল পরিমাণ পুঁথি সংগ্রহ ও সেসবের পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে কলমের ডগা দিয়ে পাখির মুখে প্রবেশ করানোর চিত্রটি শিক্ষার্থীকে মুখস্থপ্রবণ করে তোলার প্রচলিত শিক্ষণ-পদ্ধতিকেই নির্দেশ করে। অপরদিকে, পাখিটি চায় সকাল বেলার আলো মাখতে, গান গাইতে, পাখা ঝাপটাতে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর এই মেরুপ্রতিম পার্থক্য কোনো সুস্থ সম্পর্কের জন্ম দেয় না। ফলে 'বেয়াদব' 'অকৃতজ্ঞ' পাখিটির ডানা কেটে 'পণ্ডিতেরা এক হাতে কলম, এক হাতে সড়কি লইয়া এমনি কাণ্ড করিল যাকে বলে শিক্ষা।'– বস্তুত, এই 'শিক্ষা' শায়েস্তা করার নাম। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাঝে যে শ্রদ্ধা ও স্নেহের সম্পর্ক প্রয়োজন, তা এই জবরদস্তিমূলক পদ্ধতিতে কখনো রক্ষা করা সম্ভব নয়। এ ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী মুক্তি চায়– শিক্ষা থেকে, শিক্ষক থেকে। আর শিক্ষক ততোধিক উদ্যমে শিক্ষার্থীকে বাঁধতে চায়, দমাতে চায়, শাসাতে চায়। ফলে পরস্পরের বোধের যে-সেতু দিয়ে শিক্ষাযাত্রা সাবলীল হওয়ার কথা, সেই ভগ্ন সেতুর গোড়ায় এসে শিক্ষা স্থবির হয়ে পড়ে, জ্ঞানের পারাপার হয় না।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবনার বিস্তৃত বিবরণ পাই তাঁর 'শিক্ষা' প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই লক্ষ করেছেন, আধুনিক কালে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর সম্বন্ধটা ক্রমেই শিথিল হয়ে পড়েছে। শিক্ষার্থীর অনেক অভিযোগ শিক্ষকের বিরুদ্ধ, শিক্ষকেরও অভিযোগের অন্ত নেই। শিক্ষককে একালে শিক্ষার্থী আর যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে না, সম্মান দেখায় না। শিক্ষকও ছাত্রকে সন্তানবৎ স্নেহ করেন না, তার কল্যাণ কামনা করেন না। শিক্ষক আজ অর্থান্বেষী বুদ্ধিজীবী মাত্র– শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীর সম্বন্ধ আর্থিক লেনদেনের পর্যায়ে নেমে এসেছে। এই অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থার অবসান প্রত্যাশা করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের মতে, শিক্ষক শিক্ষাব্যবস্থার এক অপরিহার্য অংশ। সুতরাং সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার বদলে শিক্ষকের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্ববাহী। তিনি মনে করেন, শিক্ষকের সেবামূলক মনোভাব একান্ত জরুরি। পাশাপাশি শিক্ষকের থাকতে হবে চিরন্তন জ্ঞানপিপাসা। শিক্ষকের জ্ঞানতৃষ্ণা না থাকলে তিনি কিছুতেই শিক্ষার্থীর জ্ঞানচাহিদা মেটাতে পারবেন না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, '...গুরু করবেন বিদ্যা সৃষ্টির সাধনা, শিষ্য করবে বিদ্যা গ্রহণের সাধনা, যেখানে সম্পূর্ণভাবে দান, সেখানেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ সম্ভবপর, যেখানে অধ্যাপকগণ জ্ঞানের চর্চায় স্বয়ং প্রবৃত্ত সেইখানেই ছাত্রগণ বিদ্যাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়'। জ্ঞানপিপাসা ও বিদ্যা সৃজনের প্রতি শিক্ষকের অকুণ্ঠ সমর্পণের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ গুরুত্ব দিয়েছেন শিক্ষকের সাত্ত্বিকগুণের প্রতিও। যাদের জাগতিক প্রত্যাশা বেশি, প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা যাদের প্রবল তাদের শিক্ষকতার পেশায় না আসারই পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। তাঁর মতে, 'জ্ঞানের আদান-প্রদানের ব্যাপারটি সাত্ত্বিক। তাহা প্রাণকে উদ্বোধিত করে।

CS CamScanner

সেইজন্য এইখানেই প্রাণের নাগাল পাওয়া সহজ। এইখানেই গুরুর সঙ্গে শিষ্যের সম্বন্ধ যদি সত্য হয় তবে ইহজীবনে তার বিচ্ছেদ হয় না। তাহা পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্বন্ধের চেয়েও গভীরতর।' কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা দেখছি, শিক্ষকরা আর্থিক লাভের আকাঙ্ক্ষায় প্রাইভেট টিউশনি, কোচিং সেন্টার প্রভৃতি কার্যক্রমে যুক্ত হয়ে পড়েছেন। ক্লাসে মনোযোগ কম দিয়ে বাইরের এসব তৎপরতার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের কাছেও স্পষ্ট। ফলে শ্রদ্ধা হারাচ্ছেন শিক্ষকরা। শিক্ষা পরিণত হচ্ছে অর্থ দিয়ে কেনা কোনো পণ্যের মতো। আর এসব কারণে এদেশে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কের উন্নয়ন তো নয়ই, ক্রমশ অধোগামী হচ্ছে। যে-কোনো সভ্য রাষ্ট্রের জন্য এই লক্ষণ ভয়াবহ বিপর্যয়ের সংকেত।

বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে তাঁর জীবনদর্শন। ঔপনিবেশিক শিক্ষাকাঠামোর বদলে তিনি প্রাচীন ভারতীয় ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শকে যুগেযাপযোগী রূপ দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। দেশীয় রুচি-আদর্শ-মানুষের সঙ্গে পরিচয়, সর্বোপরি প্রকৃতি থেকে শিক্ষালাভকে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। বদ্ধ ক্লাসরুম থেকে, চাপিয়ে দেয়া শিক্ষা ও মুখস্থকরণের ভার থেকে শিক্ষার্থীকে মুক্তি দিয়ে তিনি চেয়েছেন আত্মপ্রকাশ ও আত্মবিকাশের সহায়ক হয়ে উঠবে শিক্ষা-ব্যবস্থা। 'কোনো সন্দেহ নেই তাঁর শিক্ষাচিন্তার মূল ভিত্তি ছিল প্রাচীন ভারতীয় আশ্রমের শিক্ষা কিংবা তপোবনের শিক্ষা, কিন্তু তিনি সমকালীন বা কিছু পূর্ববর্তী শিক্ষাচিন্তাবিদদের শিক্ষাচিন্তাকে তাঁর নিজের শিক্ষাভাবনা ও কর্মের সঙ্গে সমন্বিত করে নিয়েছিলেন। এই সংশ্লেষণই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনার অনন্যতা। তবে শুধু একজন শিক্ষাচিন্তাবিদ হিসেবে নয়, একজন শিক্ষাচর্চাকারী (educational practitioner) হিসেবেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকায় তাঁকে অবতীর্ণ হতে দেখেছি আমরা।'[১৭] রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবৎকালে শিক্ষা সম্পর্কে যেসব সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন– যেমন শিক্ষককেন্দ্রিক শিক্ষা, প্রকৃতি বা পরিপার্শ্বের অনুপস্থিতি, ভালো পাঠ্যপুস্তকের অপ্রতুলতা, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, যথার্থ শিক্ষার মাধ্যমের (ভাষার) প্রতি অনীহা, ডিগ্রিনির্ভর শিক্ষা ইত্যাদি সমস্যা এখনও দূর হয় নি কিংবা অমীমাংসিত রয়ে গেছে। কিছু কিছু প্রসঙ্গ আবার বেশ জটিল হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবদ্দশাতেই চিন্তা ও কর্মের মধ্য দিয়ে এসব শিক্ষাসমস্যার অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বাস্তবানুগ সমাধান দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর নানা প্রবন্ধ, অভিভাষণ ও চিঠিপত্রে তাঁর শিক্ষাচিন্তার প্রতিফলন আমরা লক্ষ করি। 'তোতা-কাহিনী'ও তাঁর শিক্ষাচিন্তার উজ্জ্বল প্রকাশ। এ গল্পের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের নির্দেশিত শিক্ষা-ভাবনা অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো গেলে, তা-ই হবে যথার্থ শিক্ষার পথ, মুক্তির পাথেয়।

তথ্যসূত্র:

১. টমাস বেবিংটন মেকলে, 'মিনিট অন দ্যা ইন্ডিয়ান এডুকেশন', উদ্ধৃত : *উপনিবেশবাদ ও উত্তর-ঔপনিবেশিক পাঠ*, (সম্পাদনা– ফকরুল চৌধুরী), র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৭৪

২. উদ্ধৃত : মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *একজন ভারতীয় বাঙালির আত্মসমালোচনা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ১১৫

৩. গৌরদাস হালদার, *ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)*, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭৯, পৃ. ১০-১৩

৪. গৌরদাস হালদার, *ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩

CamScanner

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বিশ্বভারতী', উদ্ধৃত : শিপ্রা সরকার, *রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনে উন্নয়ন-ভাবনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৮৪
৬. হিন্দুরঞ্জিকা, ১৭.০৪.১৮৭৫, উদ্ধৃত : মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র (১৮৪৭-১৯০৫)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৮৭, পৃ. ১০৭
৭. উদ্ধৃত : মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *একজন ভারতীয় বাঙালির আত্মসমালোচনা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭-১০৮
৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "শিক্ষাসমস্যা", 'শিক্ষা', *প্রবন্ধসমগ্র*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, আগস্ট ২০০০, পৃ.
৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিক্ষাসমস্যা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭৮
১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'তোতা-কাহিনী', কিশোর রবীন্দ্র-রচনাসংগ্রহ ২, (সম্পাদনা– হায়াৎ মামুদ), প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. ২৪৪
১১. শিপ্রা সরকার, *রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনে উন্নয়ন-ভাবনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৩৭
১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি', উদ্ধৃত : মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭
১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিক্ষার বাহন', প্রবন্ধসমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮৯
১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিক্ষা ও সংস্কৃতি', প্রবন্ধসমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯৩
১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "শিক্ষার হেরফের", 'শিক্ষা', প্রবন্ধসমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬৬
১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'তোতা-কাহিনী', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৪
১৭. মাসুদুজ্জামান, *রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিক্ষাভাবনা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৬, পৃ. ১২

CamScanner

ইয়াসমীন আরা লেখা*

রবীন্দ্র ভাবনায় শিক্ষা ও সমাজ

সারসংক্ষেপ : *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দার্শনিক চিন্তার অধিকারী ছিলেন। দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাস্তবতার নিরিখে তিনি জগতকে দেখেছেন। জগতের মানুষের কল্যাণ কামনায় তাঁর হৃদয়-মন ব্যথিত হয়েছে। জনকল্যাণের চিন্তায় তিনি তাঁর প্রবন্ধসমূহ রচনা করেছেন। এ-সকল প্রবন্ধে তিনি বেশি জোর দিয়েছেন শিক্ষা-ভাবনায়। যার বেশির ভাগই ছিল সমাজচিন্তামূলক। ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার মূলসূত্র এ প্রবন্ধে বিধৃত হয়েছে। কোন প্রক্রিয়ায় ব্যক্তির আত্মিক ও মানসিকসত্তার স্বাভাবিক বিকাশ সাধিত হবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক্ষেত্রে তাঁর দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন স্পষ্টভাবে। এ প্রবন্ধে ব্যক্তির স্বাধীনতা বিকাশের ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন স্বাধীন ও স্বাভাবিক সমাজ সৃষ্টির জন্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তৎকালীন বাংলাদেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি বিশ্লেষণে ও তা নিরসনে গভীর অন্তর্দৃষ্টির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার স্বাভাবিক বিকাশধারার উপায়ের ওপর জোর দিয়েছেন। কারণ এটাকেই তিনি স্বাধীন ও মর্যাদাবান সমাজসত্তা নির্মাণের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করেছেন। ব্যক্তিমানস ও সমাজমানসকে বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে এ দু'য়ের অর্থাৎ বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে দেশমাতৃকার সম্পর্ক নিবিড় করার ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এখানে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত স্পষ্ট ও সুদূরপ্রসারী। সমাজ থেকে অন্ধসংস্কার দূর করে যুক্তিনির্ভর ও বিজ্ঞান সচেতন জনগোষ্ঠী সৃষ্টির সচেষ্ট প্রয়াস তাঁর মধ্যে লক্ষ করা যায়। আমাদের মতো কৃষিপ্রধান সমাজে কৃষিজীবীদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা তথা মৌলিক শিক্ষার বিস্তার ঘটানোর ওপর জোর দেওয়ার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী বাস্তববাদী ও প্রয়োগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলাদেশে শিক্ষাসমস্যার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে বিরাজমান কৃত্রিম ভাব ও পদ্ধতিকে দোষারোপ করেছেন। এ সমস্যা সমাধানের প্রশ্নে তিনি আদর্শবাদী ও প্রকৃতিবাদী দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছেন। বাংলাদেশের শিক্ষাসমস্যার প্রকৃতি চিহ্নিত করতে তিনি ইউরোপের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সমাজের সম্পর্কের বিষয়টি নিয়ে এসেছেন। সমাজে নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কতকগুলো পদক্ষেপও গ্রহণ করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি নারী সমাজের কথা ভেবেছেন; নারীর শৃঙ্খলমুক্তি তথা নারীর উন্নতির কথা ভেবেছেন। রবীন্দ্র শিক্ষাচিন্তার সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের জন্য আজও অনেকখানিই তাৎপর্যপূর্ণ। আজও ব্যক্তি এবং জাতীয় সংকটে আমরা বার বার রবীন্দ্রনাথের নিকট ফিরে যাই।*

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক। সাহিত্যের প্রায় সকল শাখায়ই তিনি তাঁর পদচারণা এবং প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন ; কী কাব্যে, কী নাটকে, কী উপন্যাসে, কী ছোটগল্পে, কী প্রবন্ধে—আজও তিনি অনতিক্রম্য। সাহিত্যে তিনি দার্শনিক চিন্তার অধিকারী ছিলেন।

*অধ্যাপক, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা, বাংলাদেশ

CamScanner

দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাস্তবতার নিরিখে তিনি জগতকে দেখেছেন। জগতের মানুষের কল্যাণ কামনায় তাঁর হৃদয়-মন ব্যথিত হয়েছে। জনকল্যাণের চিন্তায় তিনি তাঁর প্রবন্ধসমূহ রচনা করেছেন। এ-সকল প্রবন্ধে তিনি বেশি জোর দিয়েছেন শিক্ষা-ভাবনায়। যার বেশির ভাগই ছিল সমাজচিন্তামূলক।

'শিক্ষার হেরফের' শীর্ষক লেখাটি শিক্ষা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ। এটি 'রাজশাহী অ্যাসোসিয়েশনে' তিনি পাঠ করেন ১২৯৯ সনে। 'সাধনা' পত্রিকায় প্রবন্ধটি ঐ সনেই মুদ্রিত হয়। ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার মূলসূত্র এ প্রবন্ধে বিধৃত হয়েছে। কোন প্রক্রিয়ায় ব্যক্তির আত্মিক ও মানসিকসত্তার স্বাভাবিক বিকাশ সাধিত হবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক্ষেত্রে তাঁর দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন স্পষ্টভাবে। এ প্রবন্ধে ব্যক্তির স্বাধীনতা বিকাশের ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন স্বাধীন ও স্বাভাবিক সমাজ সৃষ্টির জন্য। তিনি বলেছেন :

যতটুকু অত্যাবশ্যক কেবল তাহারই মধ্যে কারারুদ্ধ হইয়া থাকা মানবজীবনের ধর্ম নহে। আমরা কিয়ৎপরিমাণে আবশ্যকশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া থাকি এবং কিয়ৎপরিমাণ স্বাধীন। আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে বদ্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া ঠিক সেই সাড়ে তিন হাত পরিমাণ গৃহ নির্মাণ করিলে চলে না। স্বাধীন চলাফেরার জন্য অনেকখানি স্থান রাখা আবশ্যক, নতুবা আমাদের স্বাস্থ্য এবং আনন্দের ব্যাঘাত হয়। শিক্ষা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে।[১]

শিক্ষার সংকীর্ণ উদ্দেশ্যের মধ্যে শিক্ষার্থীকে আবদ্ধ রাখলে তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ব্যাহত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে :

> যতটুকু কেবলমাত্র শিক্ষা অর্থাৎ অত্যাবশ্যক তাহারই মধ্যে শিশুদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনোই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না। অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না– বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে বালক থাকিয়াই যায়।[২]

শিশু বয়সের শিক্ষার্থীর স্বাধীনতার ওপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষ মনোযোগ ছিল। এ স্বাধীনতাকে তিনি শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের অবলম্বন হিসেবে গণ্য করেছেন। নিজ সমাজে এ স্বাধীনতার অভাব দেখে তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন,

> বাঙালির ছেলের মতো এমন হতভাগ্য আর কেহ নাই। অন্য দেশের ছেলেরা যে বয়সে নবোদগত দন্তে আনন্দমনে ইক্ষু চর্বণ করিতেছে, বাঙালির ছেলে তখন ইস্কুলের বেঞ্চির উপর কোঁচাসমেত দুইখানি শীর্ণ খর্ব চরণ দোদুল্যমান করিয়া শুধুমাত্র বেত হজম করিতেছে, মাস্টারের কটু গালি ছাড়া তাহাতে আর কোনোরূপ মসলা মিশানো নাই।[৩]

ভবিষ্যতের মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে এর সুদূরপ্রসারী ফলাফল প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন:

CamScanner

> তাহার ফল হয় এই, হজমের শক্তিটা সকল দিক হইতেই হ্রাস হইয়া আসে। যথেষ্ট খেলাধুলা এবং উপযুক্ত আহারাভাবে বঙ্গসন্তানের শরীরটা যেমন অপুষ্ট থাকিয়া যায়, মানসিক পাকযন্ত্রটাও তেমনি পরিণতি লাভ করিতে পারে না। আমরা যতই বি.এ. এম.এ. পাস করিতেছি, রাশি রাশি বই গিলিতেছি, বুদ্ধিবৃত্তিটা তেমন বেশ বলিষ্ঠ এবং পরিপক্ব হইতেছে না। তেমন মুঠা করিয়া কিছু ধরিতে পারিতেছি না, তেমন আদ্যোপান্ত কিছু গড়িতে পারিতেছি না, তেমন জোরের সহিত কিছু দাঁড় করাইতে পারিতেছি না। আমাদের মতামত কথাবার্তা এবং আচার-অনুষ্ঠান ঠিক সাবালকের মতো নহে। সেইজন্য আমরা অত্যুক্তি আড়ম্বর এবং আস্ফালনের দ্বারা আমাদের মানসিক দৈন্য ঢাকিবার চেষ্টা করি।[৪]

এ অবস্থার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আনন্দহীন শিক্ষা ও মুখস্থ বিদ্যাকে দায়ী করেছেন। শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে আনন্দময় পরিবেশ না থাকাতে শিক্ষার্থীর গ্রহণশক্তি, ধারণাশক্তি ও চিন্তাশক্তি সহজে ও স্বাভাবিক নিয়মে বল লাভ করে না বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। "এই মানসিকশক্তি -হ্রাসকারী নিরানন্দ শিক্ষার হাত বাঙালি কী করিয়া এড়াইবে"।[৫]

নিরানন্দ শিক্ষার বিষয়ে তিনি বিশেষ ভাবনা প্রকাশ করেছেন। এ সংকটের মূলে তিনি দুটি বিশেষ সমস্যাকে চিহ্নিত করেছেন। প্রথমটি হলো শিক্ষায় ইংরেজি ভাষার প্রাধান্য, দ্বিতীয়টি হলো যোগ্য শিক্ষকের অভাব। রবীন্দ্রনাথের মতে : "ইংরেজি ভাষাটা অতিমাত্রায় বিজাতীয় ভাষা। ... আগাগোড়া কিছুই পরিচিত নহে, সুতরাং ধারণা জন্মিবার পূর্বেই মুখস্থ আরম্ভ করিতে হয়। তাহাতে না চিবাইয়া গিলিয়া খাইবার ফল হয়"।[৬]

অন্যদিকে

> নীচের ক্লাসে যে-সকল মাস্টার পড়ায় তাহারা কেহ এন্ট্রেন্স পাস, কেহ-বা এন্ট্রেস ফেল, ইংরেজি ভাষা ভাব আচার ব্যবহার এবং সাহিত্য তাহাদের নিকট কখনোই সুপরিচিত নহে। তাহারাই ইংরেজির সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় সংঘটন করাইয়া থাকে। তাহারা না জানে ভালো বাংলা, না জানে ভালো ইংরেজি; কেবল তাহাদের একটা সুবিধা এই যে, শিশুদিগকে শিখানো অপেক্ষা ভুলানো ঢের সহজ কাজ, এবং তাহাতে তাহারা সম্পূর্ণ কৃতকার্যতা লাভ করে।[৭]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, এ অবস্থায় প্রকৃত শিক্ষা হয় না। এ শিক্ষা কেবল পরীক্ষা পাসের শিক্ষা আর চাকরি জোটানোর শিক্ষা। এ শিক্ষায় শিক্ষার্থীর দেহ, মন ও আত্মা পরিপুষ্ট হয় না। তাঁর মতে এ জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় প্রবেশ না করলেই বরং শিশুর উপকার হতো। ...যদি কিছুই না শিখিত তবে খেলা করিবার অবসর থাকিত, গাছে চড়িয়া, জলে ঝাঁপাইয়া, ফুল ছিঁড়িয়া প্রকৃতিজননীর ওপর সহস্র দৌরাত্ম করিয়া শরীরের পুষ্টি, মনের উল্লাস এবং বাল্যপ্রকৃতির পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিত।[৮] তাঁর মতে, এ জাতীয় শিক্ষা শিশুকে 'প্রকৃতির সত্যরাজ্য' এবং 'সাহিত্যের কল্পনারাজ্য'-এ প্রবেশ করার পথ রুদ্ধ করে দেয়। ফলে কখনোই তার মানসিক পুষ্টি, চিত্তের প্রসার, চরিত্রের বলিষ্ঠতা লাভ হতে পারে না। প্রাপ্ত বয়সে সে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। সে নিজের বল ও শক্তি খাটিয়ে জীবন চলার পথে বাধা অতিক্রম করতে পারে না। নিজের স্বাভাবিক তেজে মস্তক তুলে ধরতে পারে না। সে কেবল মুখস্থ করতে, নকল করতে তথা অন্যের অনুকরণ করতে শেখে। তার ভেতরে অন্যের অধীন থাকার প্রবণতাই রয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যক্তির জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় দু'ধরনের শক্তির কথা বলেছেন। এ দু'টো হলো 'চিন্তাশক্তি' ও কল্পনাশক্তি'। কিন্তু শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ শক্তি দু'টোর বিকাশ ঘটছে না বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। সার্বিক বিচারে তিনি বলেছেন, ...

CamScanner

এইরূপে আমাদের শিক্ষার সহিত জীবনের গৃহবিচ্ছেদ ক্রমশ বাড়িয়া উঠে, প্রতিমুহূর্তে পরস্পর পরস্পরকে সুতীব্র পরিহাস করিতে থাকে এবং অসম্পূর্ণ জীবন ও অসম্পূর্ণ শিক্ষা লইয়া বাঙালির সংসারযাত্রা দুই-ই সঙের প্রহসন হইয়া দাঁড়ায়।[৯] এ প্রহসন রোধ করার জন্য শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সামঞ্জস্য সাধনকেই তিনি সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হিসেবে গণ্য করেছেন। আর এ সামঞ্জস্য বিধানের উপায়ও তিনি বলে দিয়েছেন। কিন্তু এ মিলন কে সাধন করিতে পারে। বাংলাভাষা, বাংলা সাহিত্য।[১০] তিনি মনে করেন বাংলাদেশের (গোটা বাংলা ভূখণ্ড অর্থে) শিশু তথা বাঙালি শিক্ষার্থীর সুস্থ ও স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠা সম্ভব কেবল তার মাতৃভাষা ও তার শেকড়সম্পৃক্ত সাহিত্যরস দিয়ে।

'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এভাবে তৎকালীন বাংলাদেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি বিশ্লেষণে ও তা নিরসনে গভীর অন্তর্দৃষ্টির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। প্রতিটি ছত্রেই তিনি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার স্বাভাবিক বিকাশধারার উপায়ের ওপর জোর দিয়েছেন। কারণ এটাকেই তিনি স্বাধীন ও মর্যাদাবান সমাজসত্তা নির্মাণের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করেছেন।

রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শনে বিজ্ঞানচর্চার গুরুত্ব বরাবরই জোর পেয়েছে। তবে তিনি প্রকৃতপক্ষে সমাজের উন্নতির জন্য বিজ্ঞানচর্চার কথা বলেছেন। তিনি বিজ্ঞানচর্চাকে 'স্পল্পসংখ্যক আধুনিক ব্রাহ্মণস্থানীয়দের'[১১] মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখাকে সমর্থন করেন নি। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত সায়েন্স এসোসিয়েশন প্রসঙ্গে ১৩০৫ সনে লেখা 'প্রসঙ্গ কথা-১' এ তিনি উল্লেখ করেছেন, 'যে-কয়জনা ইংরেজিতে বিজ্ঞান শেখে সভা তাহাদের নিকট ইংরেজিভাষায় বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করে; বাকি সমস্ত বাঙালির সহিত তাহার কিছুমাত্র সংস্রব নাই।'[১২] বিজ্ঞানচর্চা ব্যক্তি ও সমাজের সত্যদর্শনের জন্য কতখানি প্রয়োজন তা বুঝাতে তিনি বলেছেন, বিজ্ঞানচর্চার দ্বারা জিজ্ঞাসাবৃত্তির উদ্রেক, পরীক্ষণশক্তির সূক্ষ্মতা এবং চিন্তনক্রিয়ার যাথাতথ্য জন্মে এবং সেই সঙ্গে সর্বপ্রকার ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত ও অন্ধসংস্কার সূর্যোদয়ে কুয়াশার মতো দেখিতে দেখিতে দূর হইয়া যায়।[১৩] সমাজের কল্যাণের জন্য তিনি বিজ্ঞানের আলো সাধারণভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বলেছেন। ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকেই বিজ্ঞানচর্চা হলেও ভিত্তির সংকীর্ণতা ও ব্যাপ্তির অভাবগত কারণ তা অধোগতি লাভ করে বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, 'আমরা বারংবার দেখিয়াছি আমাদের দেশের ইংরেজিশিক্ষিত বিজ্ঞান ঘেঁষা ছাত্ররাও কালক্রমে তাঁহাদের সমস্ত বৈজ্ঞানিক কায়দা ঢিলা দিয়া অযৌক্তিক সংস্কারের হস্তে আত্মসমর্পণপূর্বক বিশ্রামলাভ করেন।'[১৪] তাঁর মতে, বিজ্ঞানচর্চার সাথে দেশমাতৃকার শেকড়ের সম্পর্ক নেই বলে এমন ঘটে। ব্যক্তিমানস ও সমাজমানসকে বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে এ দু'য়ের অর্থাৎ বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে দেশমাতৃকার সম্পর্ক নিবিড় করার ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এখানে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত স্পষ্ট ও সুদূরপ্রসারী। সমাজ থেকে অন্ধসংস্কার দূর করে যুক্তিনির্ভর ও বিজ্ঞান সচেতন জনগোষ্ঠী সৃষ্টির সচেষ্ট প্রয়াস তাঁর মধ্যে লক্ষ করা যায়। তাঁর মধ্যে জাগরুক থাকা আধুনিক মননের প্রকৃষ্ট রূপ এটা।

আমাদের মতো কৃষিপ্রধান সমাজে কৃষিজীবীদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা তথা মৌলিক শিক্ষার বিস্তার ঘটানোর ওপর জোর দেওয়ার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী বাস্তববাদী ও প্রয়োগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমত, তিনি বাংলাদেশে প্রচলিত মৌলিক শিক্ষাকে স্বাধীন রাখতে মত দিয়েছেন।

CamScanner

ইংরেজ সরকারের হাতে তার দায়িত্ব দিতে সায় দেন নি। দ্বিতীয়ত, এ শিক্ষার মাধ্যমে গণমানুষকে লোকহিতে উদ্বুদ্ধ করা এবং জীবিকা অর্জনের উপযোগী করে তোলার ওপর জোর দিয়ে বলেছেন : ইহাদের শিক্ষা গোড়া হইতে এমনভাবে দিতে হইবে যাহাতে লোকহিত কাহাকে বলে তাহা ইহারা ভালো করিয়া জানিতে এবং জীবিকা উপার্জনের জন্য হাতে-কলমে সকল রকমে তৈরি হইয়া উঠিতে পারে।[১৫]

'শিক্ষার হেরফের' (১২৯৯) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে মনোভাব ব্যক্ত করেছেন বরাবর সেটাই তিনি ধরে রেখেছেন। 'শিক্ষার সংস্কার' (১৩১৩) প্রবন্ধে তিনি অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। এসব ক্ষেত্রেও তিনি ইংরেজ প্রবর্তিত ইংরেজি ভাষার প্রাধান্যভিত্তিক শিক্ষাপ্রণালীর সমালোচনা করেছেন।

বিদ্যাশিক্ষায় আমাদেরও মন খাটিতেছে না–আমাদেরও শিক্ষাপ্রণালীতে কলের অংশ বেশি। যে-ভাষায় আমাদের শিক্ষা সমাধা হয়, সে-ভাষায় প্রবেশ করিতে আমাদের অনেক দিন লাগে।[১৬]

এ প্রণালীর শিক্ষায় শিক্ষার্থীর বিকৃত ও অপরিপক্ব বিকাশ বিষয়ে তিনি বলেছেন :

> এইরূপ শিক্ষা প্রণালীতে আমাদের মন যে অপরিণত থাকিয়া যায়, বুদ্ধি যে সম্পূর্ণ স্ফূর্তি পায় না, সে কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। ... আমাদের ভাবাচিন্তা আমাদের লেখাপড়ার মধ্যে সেই ছাত্র অবস্থার-ক্ষীণতাই বরাবর থাকিয়া যায়; আমরা নকল করি, নজির খুঁজি, এবং স্বাধীন মত বলিয়া যাহা প্রচার করি, তাহা হয় কোনো-না কোনো মুখস্থ বিদ্যার প্রতিধ্বনি, নয় একটি ছেলেমানুষি ব্যাপার।[১৭]

এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন :

> নিজে চিন্তা করিবে, নিজে সন্ধান করিবে, নিজে কাজ করিবে, এমনতরো মানুষ তৈরি করিবার প্রণালী এক, আর পরের হুকুম মানিয়া চলিবে, পরের মতের প্রতিবাদ করিবে না, ও পরের কাজে জোগানদার হইয়া থাকিবে মাত্র, এমন মানুষ তৈরির বিধান অন্যরূপ।[১৮]

তিনি শক্তভাবে শিক্ষাব্যবস্থার এই নেতিবাচক ফলাফলের বিরোধিতা করেছেন। আর দেশের শিক্ষার ভার নিজেদের হাতে গ্রহণ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন :

> আমরা বিদ্যালয়ের সাহায্যে এ দেশে তাঁবেদারির চিরস্থায়ী ভিত্তি পত্তন করিতে কিছুতেই রাজি হইতে পারি না। কাজেই, সময় উপস্থিত হইয়াছে, একজন বিদ্যাশিক্ষাকে যেমন করিয়া হউক নিজের হাতে গ্রহণ করিতেই হইবে।[১৯]

বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বসমাজের উন্নতি ও মঙ্গলসাধনের মানসে এবং নিজ সমাজকে সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষার তাগিদে শিক্ষাসংস্কার প্রশ্নে স্বদেশভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দিয়েছেন।

তিনি বিদেশি সরকারের হাতে স্বদেশের শিক্ষার দায়িত্ব দিতে কোনোভাবেই রাজি ছিলেন না। তিনি বলেছেন :

> দেশের লোককে শিশুকাল হইতে মানুষ করিবার সদুপায় যদি নিজে উদ্‌ভাবন এবং তাহার উদ্যোগ যদি নিজে না করি, তবে আমরা সর্বপ্রকারে বিনাশপ্রাপ্ত হইব–অন্নে মরিব, স্বাস্থ্যে মরিব, বুদ্ধিতে মরিব, চরিত্রে মরিব– ইহা নিশ্চয়।[২০]

এ মরার হাত থেকে বাঁচার উপায় হিসেবে তিনি সমাজে 'প্রকৃত শিক্ষা' বিস্তারের কথা বলেছেন। এই প্রশ্নে তিনি সরকারের ভূমিকার বিষয়টি নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেছেন। তিনি সমাজ ও সরকারকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে সমাজের পক্ষ অবলম্বন করেছেন।

বাংলাদেশে শিক্ষাসমস্যার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে বিরাজমান কৃত্রিম ভাব ও পদ্ধতিকে দোষারোপ করেছেন। এ সমস্যা সমাধানের প্রশ্নে তিনি আদর্শবাদী ও প্রকৃতিবাদী দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছেন। বাংলাদেশের শিক্ষাসমস্যার প্রকৃতি চিহ্নিত করতে তিনি ইউরোপের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সমাজের সম্পর্কের বিষয়টি নিয়ে এসেছেন। তিনি ইউরোপ ও বাংলাদেশে বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যকার সম্পর্কের একটা তুলনা করেছেন এভাবে :

> য়ুরোপে মানুষ সমাজের ভিতরে থাকিয়া মানুষ হইতেছে, ইস্কুল তাহার কথঞ্চিৎ সাহায্য করিতেছে। লোকে যে-বিদ্যা লাভ করে সে-বিদ্যাটা সেখানকার মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন নহে–সেইখানে তাহার চর্চা হইতেছে, সেইখানেই তাহার বিকাশ হইতেছে-সমাজের মধ্যে নানা আকারে নানা ভাবে তাহার সঞ্চার হইতেছে, লেখাপড়ায় কথাবার্তায় কাজেকর্মে তাহা অহরহ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে। সেখানে জনসমাজ যাহা কালে কালে নানা ঘটনায় নানা লোকের দ্বারায় লাভ করিয়াছে, সঞ্চয় করিয়াছে এবং ভোগ করিতেছে তাহাই বিদ্যালয়ের ভিতর দিয়া বালকদিগকে পরিবেশনের একটা উপায় করিয়াছে মাত্র।[২১]

এ প্রক্রিয়ায় ইউরোপ বিদ্যালয় সমাজের সঙ্গে মিশে আছে এবং সমাজ থেকে রস আহরণ করে তার ফল সমাজকে দান করছে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এমনটি হচ্ছে না। এদেশে সমাজ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে ব্যবধান বিস্তর। তিনি বলেছেন :

> কিন্তু বিদ্যালয় যেখানে চারি দিকের সমাজের সঙ্গে এমন এক হইয়া মিশিতে পারে নাই, যাহা বাহির হইতে সমাজের উপরে চাপাইয়া দেওয়া, তাহা শুষ্ক তাহা নির্জীব।[২২]

এই শুষ্ক ও নির্জীব প্রক্রিয়ার কারণে শিক্ষা এদেশে সমাজে ব্যক্তির জীবন পূর্ণ করতে পারছে না। তবে রবীন্দ্রনাথ এদেশে ইউরোপের শিক্ষাব্যবস্থার হুবহু অনুকরণও সমর্থন করেন নি। য়ুরোপের বিদ্যালয়ের অবিকল বাহ্য নকল করিলেই আমরা যে সেই একই জিনিস পাইব এমন নহে।[২৩]

তিনি স্বদেশ তথা স্বসমাজের মধ্যেই এর সমাধান পাওয়ার চিন্তা করেছেন। এখানে তিনি প্রাচীন ভারতবর্ষের তপোবনভিত্তিক আশ্রমের শিক্ষাব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এ শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শধর্মিতা ও প্রকৃতি সংশ্লিষ্টদের প্রতি তিনি অনুরাগ প্রকাশ করেছেন। আশ্রমে গুরু ও শিষ্যের সহজ স্বাভাবিক সম্পর্ক, জ্ঞান বিতরণ ও আহরণে অকৃত্রিম প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতাকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। শিক্ষার্থীর অধ্যয়নকালে 'ব্রহ্মচর্যপালন' ও গুরুগৃহে বাসকে তিনি সমর্থন করেছেন। তবে এ ব্যবস্থাকে তিনি জীবনে বৈরাগ্য সাধনের উপায় হিসেবে গণ্য করেন নি। সমাজ জীবনে ব্যক্তির স্বাভাবিক ও সুস্থ ভূমিকা পালনের প্রস্তুতিকাল হিসেবে গণ্য করেছেন। সংসার জীবনের টানাপোড়নে যাতে শিশুদের 'হৃদয়বৃত্তি ভ্রূণ অবস্থায়' কৃত্রিম আঘাতে বিনষ্ট না হয়, তাদের মন যাতে দুর্বল ও লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয় সেজন্য তিনি ব্রহ্মচর্য পালনের কথা বলেছেন। তাঁর মতে,

> ... জীবনের আরম্ভকালে বিকৃতির সমস্ত কৃত্রিম কারণ হইতে স্বভাবকে প্রকৃতিস্থ রাখা নিতান্তই আবশ্যক। প্রবৃত্তির অকালবোধন এবং বিলাসিতার উগ্র উত্তেজনা হইতে মনুষ্যত্বের নবোদ্‌গমের অবস্থাকে স্নিগ্ধ করিয়া রক্ষা করাই ব্রহ্মচর্য পালনের উদ্দেশ্য।[২৪]

রবীন্দ্রনাথের মতে, এর ফলে শিশুদের পূর্ণবিকাশ ঘটে। তারা যথার্থভাবে স্বাধীনতার আনন্দলাভ করতে পারে। শুধু তাই নয় এর ফলে শিশুদের নবাঙ্কুরিত নির্মল ও সতেজ মন সমস্ত শরীরের মধ্যে দীপ্তির সঞ্চার করে।

শিশুর আদর্শ শিক্ষার জন্যই রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচর্যের সাথে প্রকৃতি সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি অপরিহার্য হিসেবে গণ্য করেছেন। তাঁর মতে,

> অগ্নি বায়ু জলস্থল বিশ্বকে বিশ্বাত্মা দ্বারা সহজে পরিপূর্ণ করিয়া দেখিতে শেখাই যথার্থ শেখা। এই শিক্ষা শহরের ইস্কুলে ঠিকমত সম্ভবে না; সেখানে বিদ্যাশিক্ষার কারখানাঘরে জগৎকে আমরা একটা যন্ত্র বলিয়াই শিখিতে পারি।[২৫]

রবীন্দ্রনাথ জানতেন বৈষয়িক লোকজন তাঁর এ মতামতে সায় দেবেন না। তারপরও তিনি তাঁর নিজের মত থেকে দূরে সরে যান নি। কারণ তিনি প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মকে সবার সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন। এজন্য তিনি আবার বলেছেন :

> খোলা আকাশ খোলা বাতাস এবং গাছপালা মানবসন্তানের শরীরমনের সুপরিণতির জন্য যে অত্যন্ত দরকার এ কথা বোধ হয় কেজো লোকেরাও একেবারে উড়াইয়া দিতে পারিবেন না।[২৬]

এ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ আবেগ-আপ্লুত হয়ে পড়েছেন। শিশুদের ওপর প্রকৃতির বৈচিত্র্য ও মোহনীয়রূপ কী রকম সুফল বয়ে আনে তা প্রবীণ অভিভাবক ও বিষয়ী মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন :

> বালকদের হৃদয় যখন নবীন আছে, কৌতূহল যখন সজীব এবং সমুদয় ইন্দ্রিয়শক্তি যখন সতেজ তখনই তাহাদিগকে মেঘ ও রৌদ্রের লীলাভূমি অবারিত আকাশের তলে খেলা করিতে দাও– তাহাদিগকে এই ভূমির আলিঙ্গন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়ো না। স্নিগ্ধনির্মল প্রাতঃকালে সূর্যোদয় তাহাদের প্রত্যেক দিনকে জ্যোতিময় অঙ্গুলির দ্বারা উদঘাটিত করুক এবং সূর্যাস্তদীপ্ত সৌম্যগম্ভীর সায়াহ্ন তাহাদের দিবাসনকে নক্ষত্রখচিত অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে নিমীলিন করিয়া দিক। তরুলতার শাখাপল্লবিত নাট্যশালায় ছয় অঙ্কে ছয় ঋতুর নানারসবিচিত্র গীতিনাট্যাভিনয় তাহাদের সম্মুখে ঘটিতে দাও। তাহারা গাছের তলায় দাঁড়াইয়া দেখুক, নববর্ষা প্রথমযৌবরাজ্যে অভিষিক্ত রাজপুত্রের মতো তাহার পুঞ্জ পুঞ্জ সজলনিবিড় মেঘ লইয়া আনন্দগর্জনে চিরপ্রত্যাশী বনভূমির উপরে আসন্নবর্ষণের ছায়া ঘনাইয়া তুলিতেছে; এবং শরতে অন্নপূর্ণা ধরিত্রীর বক্ষে শিশিরে সিঞ্চিত, বাসাতে চঞ্চল নানাবর্ণে বিচিত্র, দিগন্তব্যাপ্ত শ্যামল সফলতার অপর্যাপ্ত বিস্তার স্বচক্ষে দেখিয়া তাহাদিগকে ধন্য হইতে দাও। হে প্রবীণ অভিভাবক, হে বিষয়ী, তুমি কল্পনাবৃত্তিকে যতই নির্জীব, হৃদয়কে যতই কঠিন করিয়া থাক, দোহাই তোমার, এ কথা অন্তত লজ্জাতেও বলিয়ো না যে, ইহার কোনো আবশ্যক নাই;...।[২৭]

তিনি প্রচলিত বিদ্যালয়গুলোকে বিশেষত শহরের বিদ্যালয়গুলোকে কারাগারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। শিশুদের শিক্ষাকে আনন্দময় করার লক্ষ্যে এ জাতীয় বিদ্যালয়কে পরিহার করে প্রকৃতির কোলে আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। তাঁর মতে :

> অতএব, আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই। সেখানে অধ্যাপকগণ নিভৃতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিবেন এবং ছাত্রগণ সেই জ্ঞানচর্চার যজ্ঞক্ষেত্রের মধ্যেই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে।[২৮]

'জাতীয় বিদ্যালয়' ও 'আবরণ' শীর্ষক প্রবন্ধ দু'টিতেও তিনি উদার প্রকৃতির সংশ্রবে ব্রহ্মচর্য ও কৃচ্ছতাপালনের মাধ্যমে শিশুর শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

প্রকৃতির কোলে শিক্ষার আয়োজন করার উদ্দেশ্যের এক দিক হলো শিশুর স্বাভাবিক ব্যক্তিসত্তার বিকাশ; অন্যদিক হলো প্রকৃতির মধ্যে বিরাজমান স্বাভাবিক ধারা শিশুকে অনুধাবন করানো, যাতে সমাজের স্বাভাবিক বিকাশধারার প্রতি সে যেন অনুরক্ত হয়। সমাজজীবনে সে যেন কৃত্রিম ভূমিকা পালন না করে। তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য এ জাতীয় ব্যক্তি সমষ্টি সমন্বয়ে সুস্থ, স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রস্ফুটিত সামাজিক ধারা সৃষ্টি করা।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আদর্শবাদ ও প্রকৃতিবাদ শুধু তাত্ত্বিক বিষয় ছিল না। ১৯০১ সালের ডিসেম্বর মাসে অর্থনৈতিক অসচ্ছল এবং ঋণগ্রস্থ হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫ খ্রি:) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বোলপুরের শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে একটি আবাসিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করেন। এ বিদ্যালয়ে তিনি অকৃত্রিম আদর্শ ও প্রকৃতির সৌন্দর্যের সম্মিলনে তপোবনের আবহ সৃষ্টির প্রয়াস পান।

প্রাচীন গুরুগৃহ বাসের সমস্ত নিয়ম, বিলাসিতা বর্জিত পরিবেশ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে কঠিন ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত শিক্ষার্থী এবং তেমনি উপযুক্ত শিক্ষক ছিল তাঁর অন্বিষ্ট। তিনি চেয়েছিলেন ইংরেজি শিক্ষায় এতকাল অনুদ্ঘাটিত কর্মযোগের উদ্বোধন ঘটাতে, সেই সঙ্গে তাঁর লক্ষ্য ছিল শিশুচিত্ত যেন পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্ববোধে উদীপ্ত হয়।

শিক্ষা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের যে চিন্তা ও মনোভাব তা ছেলেবেলায় তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন। তাঁর নিজের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের যে অভিজ্ঞতা তা তিনি 'জীবনস্মৃতি' (১৯১২)-তে বিশদ বর্ণনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের নিকট ছেলেবেলার শিক্ষার সবচেয়ে মধুর স্মৃতিটি হলো, 'জল পড়ে পাতা নড়ে'। অনেক বয়স পরেও জীবনের অনেক স্মৃতি ছাপিয়ে কেবল এটাই তাঁর মনে পড়েছে। কারণ তিনি বলেছেন যে তাঁর জীবনে এটাই ছিল আদিকবির প্রথম কবিতা। তাঁর দার্শনিক মনে গেঁথে ছিল ছন্দ, মিল, স্বতঃস্ফূর্ততা আর গতিশীলতা, যেটি তিনি সব সময় প্রকৃতির অকৃত্রিম স্বাভাবিক রূপের মধ্যে দেখেছেন। এটাকেই তিনি ধারণ করেছেন মনে প্রাণে। এটাই তিনি খোঁজ করেছেন সব সময় সব জায়গায়। নিজেদের পারিবারিক বিদ্যালয়ে অতি শৈশবকালে তাঁর এই যে পাওয়া এবং পরবর্তীকালে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবনে তা আর না পাওয়া তাঁকে প্রচলিত শিক্ষার প্রতি বিরাগভাজন করে তোলে। এ না পাওয়ার মর্মবেদনা তিনি সব সময় অনুভব করেছেন। তাই তিনি চেষ্টা করেছেন এমন শিক্ষাপ্রণালী সৃষ্টির যাতে শিশুরা তা পায়।

দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়সের আগেই কান্নার জোরে 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি'-তে ভর্তি হন। কিন্তু সেখানকার কঠোর শিক্ষাপ্রণালী তাঁকে ব্যথিত করে। এরূপ শিক্ষাপ্রণালীতে আদৌ শিক্ষা হয় কিনা তা নিয়ে তিনি সন্দেহ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

CamScanner

> সেখানে কী শিক্ষালাভ করিলাম মনে নাই কিন্তু একটা শাসনপ্রণালীর কথা মনে আছে। পড়া বলিতে না পারিলে ছেলেকে বেঞ্চে দাঁড় করাইয়া তাহার দুই প্রসারিত হাতের উপর ক্লাসের অনেকগুলি শ্লেট একত্র করিয়া চাপইয়া দেওয়া হইত। এরূপে ধারণাশক্তির অভ্যাস বাহির হইতে অন্তরে সঞ্চারিত হইতে পারে কি না তাহা মনস্তত্ত্ববিদদিগের আলোচ্য।[২৯]

এরপর তিনি 'নর্মাল স্কুল'-এ ভর্তি হন। কিন্তু এ স্কুলে পড়ার অভিজ্ঞতাও তাঁর সুখকর নয়। এ বিদ্যালয়ের একঘেয়েমি ব্যাপারগুলো তাঁর নিকট অর্থহীন ও দুর্বোধ্য মনে হতো। কত তাড়াতাড়ি বিদ্যালয় থেকে বিদায় নিতে পারবেন সেটাই ছিল তাঁর আগ্রহের বিষয়। শিক্ষকদের অমার্জিত ব্যবহার তাঁকে পীড়া দিত, বিদ্যালয়ের পড়াশোনা থেকে মন দূরে সরিয়ে রাখত। এ বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

> শিক্ষকদের মধ্যে একজনের কথা আমার মনে আছে, তিনি এমন কুৎসিত ভাষা ব্যবহার করিতেন যে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধাবশত তাঁহার কোনো প্রশ্নেরই উত্তর করিতাম না। সংবৎসর তাঁহার ক্লাসে আমি সকল ছাত্রের শেষে নীরবে বসিয়া থাকিতাম। যখন পড়া চলিত তখন সেই অবকাশে পৃথিবীর অনেক দুরূহ সমস্যার মীমাংসাচেষ্টা করিতাম।[৩০]

নর্মাল স্কুলের পর রবীন্দ্রনাথকে 'বেঙ্গল একাডেমি' নামক এক ফিরিঙ্গি স্কুলে ভর্তি করা হয়। আগের স্কুল দু'টোর তুলনায় এখানে তিনি কিছুটা বেশি স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ পেলেও বিদ্যালয় যে বিদ্যালয়, তাঁর ভাষায় : 'হাজার হইলেও ইহা ইস্কুল'[৩১] একথাটি তাঁর মধ্যে জাগরুক ছিল। এখানেও কৃত্রিম পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়ার চিরাচরিত বিষয়টি লক্ষ করেন, বিদ্যালয়ে শিক্ষা অর্জনে তাঁর মনকে বিরাগভাজন করে তোলে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

> ইহার ঘরগুলা নির্মম, ইহার দেয়ালগুলা পাহারাওয়ালার মতো–ইহার মধ্যে বাড়ির ভাব কিছুই নাই, ইহা খোপওয়ালা একটা বড়ো বাঙ। কোথাও কোনো সজ্জা নাই, ছবি নাই, রঙ নাই, ছেলেদের হৃদয়কে আকর্ষণ করিবার লেশমাত্র চেষ্টা নাই। ছেলেদের যে ভালো মন্দ লাগা বলিয়া একটা খুব মস্ত জিনিস আছে, বিদ্যালয় হইতে সে-চিন্তা একেবারে নিঃশেষে নির্বাসিত। সেইজন্য বিদ্যালয়ের দেউড়ি পার হইয়া তাহার সংকীর্ণ আঙিনার মধ্যে পা দিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সমস্ত মন বিমর্ষ হইয়া যাইত–অতএব, ইস্কুলের সঙ্গে আমার এই পালাইবার সম্পর্ক আর ঘুচিল না।[৩২]

বিদ্যালয়ের কঠোর শাসন ও নিষ্প্রাণ পরিবেশ বারবার রবীন্দ্রনাথকে বিদ্যালয় ছাড়া করেছে। তাঁর যে শিক্ষা তা ঘটেছে নিজের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ ও চেষ্টায়। আর এক্ষেত্রে তাঁদের পরিবারে বিরাজমান শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও পরিবেশ তাঁকে সহায়তা করেছে। পারিবারিক পরিবেশে গৃহশিক্ষকগণের তত্ত্বাবধানে তিনি বাংলা, ইংরেজি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, অস্থিবিদ্যা শিক্ষালাভ করেন। অঙ্কন, জিমন্যাস্টিঙ, সংগীত প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়েও তাঁর হাতেখড়ি হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তার যে বৈচিত্র্য ও সৃষ্টিশীল ভাব তাতে এ জাতীয় শিক্ষা পরিবেশের অবদান অনেকখানি। তবে তিনি এ শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেও ফাঁক দেখেছেন, কৃত্রিমরূপ আবিষ্কার করেছেন। জীবনের শেষদিককার লেখা 'ছেলেবেলা'-তে (১৩৪৪) এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন এভাবে:

> মাস্টারমশায় মিটমিটে আলোয় পড়াতেন প্যারী সরকারের ফার্স্ট বুক। প্রথমে উঠত হাই, তার পর আসত ঘুম, তার পর চলত চোখ-রগড়ানি। বারবার শুনতে হত, মাস্টারমশায়ের অন্য ছাত্র যতীন সোনার টুকরো ছেলে, পড়ায় আশ্চর্য মন, ঘুম পেলে চোখে নস্যি ঘষে। আর আমি? সে কথা বলে কাজ নেই। সব ছেলের মধ্যে একলা মুরখু হয়ে থাকবার মত বিশ্রী ভাবনাতেও আমাকে চেতিয়ে রাখতে পারত না।[৩৩]

CamScanner

রবীন্দ্রনাথ সর্বদা মুক্ত পরিবেশ চেয়েছেন, স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার পুরো অধিকার চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ কখনোই লক্ষ্যহীন শিক্ষার কথা চিন্তা করেন নি। বরঞ্চ তিনি লক্ষ্যের কথাই আগে ভেবেছেন। শিক্ষাকে কেন্দ্র করে তাঁর লক্ষ্যগুলো আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণে সমাজের চাহিদার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে সমাজের কোথাও তিনি স্পষ্ট লক্ষ্য রেখা দেখতে পান নি, 'আমাদের জীবনে সুস্পষ্টতা নাই। আমরা যে কী হইতে পারি, কতদূর আশা করিতে পারি, তাহা বেশ মোটা লাইনে বড়ো রেখায় দেশের কোথাও আঁকা নাই।'[০৬]

এজন্য রবীন্দ্রনাথের মতে, আমাদের দেশে শিক্ষায় প্রকৃতধারা সৃষ্টি হচ্ছে না। তিনি বলেছেন, যে ধারার শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে তা মানুষের জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট হচ্ছে না।

> এইজন্য যখন এমনতরো প্রশ্ন শুনি 'আমরা কী শিখিব-কেমন করিয়া শিখিব- শিক্ষার কোন্ প্রণালী কোথায় কী ভাবে কাজ করিতেছে'-তখন আমার এই কথা মনে হয়, শিক্ষা জিনিসটা তো জীবনের সঙ্গে সংগতিহীন একটা কৃত্রিম জিনিস নহে। আমরা কী হইব এবং আমরা কী শিখিব, এই দুটো কথা একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। পাত্র যত বড়ো জল তাহার চেয়ে বেশি ধরে না।[০৭]

বস্তুত, 'আমরা কী হইব' তা সমাজের চাহিদা থেকে নির্ধারিত হয়। সমাজ থেকে ডাক না আসলে তা ঠিক হয় না, অর্থাৎ মানুষের লক্ষ্য স্পষ্ট হয় না। ফলে ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির কিছু হয়ে ওঠার তাগিদ সৃষ্টি হয় না। তাঁর মতে :

> চাহিবার জিনিস আমাদের বেশি কিছু নাই। সমাজ আমাদিগকে কোনো বড়ো ডাক ডাকিতেছে না, কোনো বড়ে ত্যাগে টানিতেছে না-উঠা-বসা খাওয়া ছোঁওয়ার কতকগুলো কৃত্রিম নিরর্থক নিয়মপালন ছাড়া আমাদের কাছ হইতে সে আর কোনো বিষয়ে কোনো কৈফিয়ত চায় না। রাজশক্তিও আমাদের জীবনের সম্মুখে কোনো বৃহৎ সঞ্চরণের ক্ষেত্র অবারিত করিয়া দেয় নাই।[০৮]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ প্রসঙ্গে স্পষ্ট করেই বলেছেন : আমরা কোথায় আছি, কোন দিকে চলিতেছি, তাহা সুস্পষ্ট করিয়া জানা চাই। সে জানাটা যতই অপ্রিয় হউক তবু সেটা সর্বাগ্রে আবশ্যক।[০৯]

আবশ্যক এজন্য যে তাতে শিক্ষার গতি ও প্রকৃতি নির্ধারণে ও শিক্ষার সঠিক প্রণালী সৃষ্টি করে ব্যক্তি ও সমাজের বিকাশসাধন করা চলে। এখানে সমাজের চাহিদা তথা সমাজের লক্ষ্য মাফিক সমাজের বিকাশ সাধনের উপায় হিসেবে তিনি শিক্ষাকে গণ্য করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষার কথা বলতে গিয়ে 'ছেলে' শব্দটি প্রায়ই ব্যবহার করেছেন। এতে কারো কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, তিনি নারীদের শিক্ষার জন্যে নীরব ছিলেন। এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় তাঁর 'স্ত্রীশিক্ষা' (১৩২২) শীর্ষক নিবন্ধ থেকে। নারীশিক্ষা নিয়ে সমাজে পুরুষদের মধ্যে বিতর্ককে রবীন্দ্রনাথ পুরুষদের স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়াস হিসেবে দেখেছেন। এতে নারীর প্রকৃত স্বার্থ দেখতে পান নি। তিনি নারীশিক্ষার কথা বলেছেন নারীর ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার দিক থেকে, নারী কতখানি পুরুষের বশে থাকবে কিংবা কতখানি পুরুষের সমকক্ষ থাকবে সেদিক থেকে নয় 'নারীর যে পুরুষের মতো ব্যক্তিত্ব আছে, সে যে অন্যের জন্য সৃষ্ট নয়, তাহার নিজের জীবনের যে সার্থকতা আছে ...'[১০]

তিনি নারী শিক্ষার কথা চিন্তা করেছেন সর্বজনীন মানবতার দৃষ্টিকোণ থেকেও। তাঁর মন্তব্য :

বিদ্যা যদি মনুষ্যত্বলাভের উপায় হয় এবং বিদ্যালাভে যদি মানবমাত্রেরই সহজাত অধিকার থাকে তবে নারীকে কোন্ নীতির দোহাই দিয়া সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইতে পারে বুঝিতে পারি না।[৩৯]

তবে তিনি পুরুষ ও নারীর শিক্ষার ধরন-প্রকৃতির ক্ষেত্রে কিছুটা বিভেদের পক্ষে মত দিয়েছেন। 'বিশুদ্ধ জ্ঞান' অর্জনে নারী পুরুষে কোনো পার্থক্য থাকা ঠিক নয়, কিন্তু 'ব্যবহারিক শিক্ষা'র ক্ষেত্রে নারী পুরুষের শিক্ষার পার্থক্য থাকা সমীচীন বলে তিনি মনে করেছেন।[৪০] নারী ও পুরুষের শরীরের ও মনের প্রকৃতির যে পার্থক্য তাকেই এখানে তিনি যুক্তি হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। এ যুক্তির বিরোধিতা করে যারা নারীর সমকক্ষতার কথা বলেছেন তাদের সে আচরণকে তিনি 'নিতান্তই ক্ষোভ' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ নারী মনের প্রকৃতিতে ভালোবাসার যে নিগূঢ়রূপ বিরাজমান রয়েছে তাকেই সবার ওপরে স্থান দিয়েছেন। নারী 'মা' হিসেবে 'স্ত্রী' হিসেবে 'মেয়ে' হিসেবে সমাজে যে ভালোবাসা বিতরণ করে সমাজের জন্য তা খুবই প্রয়োজন। তার ব্যত্যয় ঘটলে সমাজ টেকে না এটাকেই তিনি সবার ওপরে তুলে ধরেছেন।

সমাজে নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কতকগুলো পদক্ষেপও গ্রহণ করেন। যেখানে নারীশিক্ষার বিরোধিতা লক্ষ করেছেন তার প্রতিবাদও করেছেন। নিজ পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা পত্র (৬ ভাদ্র, ১৩২৩) থেকে জানা যায় যে, সুরুলের বাড়িতে খুব ভালো রকম একটি মেয়েস্কুল খোলার অভিপ্রায় ছিল তাঁর। এমনকি অমিয় চক্রবর্তীর কাছে লেখা এক পত্রেও (২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৯) তিনি এ জাতীয় প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছিলেন যে, একদা আশ্রমের নারী বিভাগটি বৃহৎ ও বিচিত্র হয়ে উঠবে এবং তার থেকে আপনিই নারী বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভাবিত হবে। মহাত্মা গান্ধী যখন মেয়েদের ইংরেজি পড়ার বিপক্ষে কথা বলতেন তখনো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভিন্নমত পোষণ করেছেন। সহশিক্ষা বা সহ - অবস্থান সম্পর্কে রবীন্দ্রহৃদয়ে কোনো সংশয় ছিল না। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বিশ্বভারতীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের (১৯১৮) পর ১৯১৯ সালে মেয়েদের বোর্ডিং খোলা হয়। এতে করে শান্তিনিকেতনের ছাত্রী সংখ্যা বেড়ে যায়। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি নারী সমাজের কথা ভেবেছেন; নারীর শৃঙ্খলমুক্তি তথা নারীর উন্নতির কথা ভেবেছেন।

কালান্তর-এ 'নারী' (১৩৪২) শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি নারী সমাজকে উদ্দেশ করে বলেছেন : তাঁরা যেন মুক্ত করেন হৃদয়কে, উজ্জ্বল করেন বুদ্ধিকে, নিষ্ঠা প্রয়োগ করেন জ্ঞানের তপস্যায়। মনে রাখেন, নির্বিচার অন্ধরক্ষণশীলতা সৃষ্টিশীলতার বিরোধী।[৪১] তিনি নারী সমাজকে আহবান করেছেন এভাবে :

> সামনে আসছে নূতন সৃষ্টি যুগ। সেই যুগের অধিকার লাভ করতে হলে মোহমুক্ত মনকে সর্বতোভাবে শ্রদ্ধার যোগ্য করতে হবে, অজ্ঞানের জড়তা এবং সকলপ্রকার কাল্পনিক ও বাস্তবিক ভয়ের নিম্নগামী আকর্ষণ থেকে টেনে আপনাকে উপরের দিকে তুলতে হবে। ফললাভের কথা পরে আসবে-এমন কি, না আসতেও পারে কিন্তু যোগ্যতা-লাভের কথা সর্বাগ্রে।[৪২]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষার সামগ্রিক প্রশ্নে মাতৃভাষাকে সব সময় সবার ওপরে স্থান দিয়েছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষাকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে না পারাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি ভাষার অত্যধিক ব্যবহারকে তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে বরাবর গণ্য করেছেন।

CamScanner

'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' (১৯৩৬) ভাষণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষায় মাতৃভাষা ও সমাজের ভূমিকার বিষয় আবারও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'শিক্ষা সম্বন্ধে সবচেয়ে স্বীকৃত এবং সবচেয়ে উপেক্ষিত কথাটা এই যে, শিক্ষা জিনিসটি জৈব, ওটা যান্ত্রিক নয়।'[৪৩]

শিক্ষাকে জৈব হিসেবে আখ্যায়িত করার তাৎপর্য নানা দিক থেকে বিচার্য। প্রথমত, শিক্ষা জৈব বলে ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া ভাষাগত বাহন দিয়ে শিক্ষাকে আত্মস্থ করানো, মনন, চিন্তা ও হৃদয়ে ধারণ করানো সম্ভব হয় না। মাতৃভাষাই এখানে একমাত্র বাহন। তাই তিনি শিক্ষায় মাতৃভাষার প্রসঙ্গ বারবার এনেছেন। এখানে বিশেষভাবে বলেছেন, 'শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ, জগতে এই সর্বজনস্বীকৃত নিরতিশয় সহজ কথাটা বহুকাল পূর্বে একদিন বলেছিলেন; আজও তার পুনরাবৃত্তি করব।'[৪৪] দ্বিতীয়, শিক্ষা জৈব বিষয় বলে এর বিকাশ বাইরে থেকে ঘটানো সম্ভব নয়। সমাজের অভ্যন্তর থেকেই বিকাশ ঘটানো হয়।

> অরণ্য যে মাটি থেকে প্রাণরস শোষণ করে বেঁচে আছে সেই মাটিকে আপনিই প্রতিনিয়ত প্রাণের উপাদান অজস্র জুগিয়ে থাকে। তাকে কেবলই প্রাণময় করে তোলে। উপরের ডালে যে ফল সে ফলায় নীচের মাটিতে তার আয়োজন তার নিজকৃত। অরণ্যের মাটি তাই হ'য়ে উঠে আরণ্যিক, নইলে সে হত বিজাতীয় মরু।[৪৫]

এ কারণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতবর্ষে শিক্ষায় ইংরেজ প্রবর্তিত অভিসেচনক্রিয়াকে সমর্থন করতে পারেন নি। শিক্ষাবৃক্ষের জন্য গোটা সমাজ রসসেচন করবে এটাই তাঁর মত। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

> শিক্ষার অভিসেচনক্রিয়া সমাজের উপরের স্তরকেই দুই-এক ইঞ্চি মাত্র ভিজিয়ে দেবে আর নীচের স্তরপরম্পরা নিত্যনীরস কাঠিন্যে সুদূরপ্রসারিত মরুময়তাকে ক্ষীণ আবরণে ঢাকা দিয়ে রাখবে, এমন চিত্তঘাতী সুগভীর মূর্খতাকে কোনো সভ্য সমাজ অলসভাবে মেনে নেয় নি। ভারতবর্ষকে মানতে বাধ্য করেছে আমাদের যে নির্মম ভাগ্য, তাকে শতবার ধিক্কার দিই।[৪৬]

স্বদেশ ভাবনা রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শনের প্রধান দিক। স্বদেশের মানুষ, মাতৃভাষা, স্বসমাজ বার বার তাঁর শিক্ষাবিষয়ক লেখা ও চিন্তায় এসেছে। কিন্তু তিনি যে উগ্র স্বদেশি বা উগ্র জাতীয়তাবাদী নন তারও পরিচয় তিনি দিয়েছেন। বিশ্বসমাজের সঙ্গে স্বসমাজের সেতুবন্ধন গড়ে তোলা, বিশ্বের মানুষের সঙ্গে স্বদেশের মানুষের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলা তাঁর শিক্ষাদর্শনের একটি বিশেষ দিক।

কাল প্রবাহের সঙ্গে সমাজ প্রকৃতিরও যে পরিবর্তন ঘটে সে উপলব্ধি থেকে রবীন্দ্রনাথ সভ্যতাকে জাতিগত আভিজাত্যের সংকীর্ণ দেওয়ালের মধ্য আবদ্ধ না রাখার পক্ষে মত দিয়েছেন। বিদ্যাচর্চাতে বিশ্বময়তা সৃষ্টির কথা বলেছেন। 'বিদ্যাসমবায়' প্রবন্ধে তাই তিনি বলেছেন :

> একদিন চৈন পারসিক মৈশর গ্রীক রোমীয় প্রভৃতি প্রত্যেক বড়ো জাতিই ভারতীয়ের মতোই ন্যূনাধিক পরিমাণে নিজের সুরক্ষিত স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে নিজ সভ্যতাকে বড়ো করিয়া তুলিয়াছিল। পৃথিবীর এখন বয়স হইয়াছে; জাতিগত বিদ্যাস্বতন্ত্র্যকে একান্তভাবে লালন করিবার দিন আজ আর নাই। আজ বিদ্যা-সমবায়ের যুগ আসিয়াছে। সেই সমবায়ে যে বিদ্যা যোগ দিবে না, যে বিদ্যা কৌলীন্যের অভিমানে অনূঢ়া হইয়া থাকিবে সে নিষ্ফল হইয়া মরিবে।[৪৭]

মূলত বিশ শতকে দেশে বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশগুলোতে বিদ্যার যে বিস্ফোরণ ঘটেছে তার সঙ্গে এ দেশের বিদ্যার সংযোগ না ঘটলে, আদান-প্রদান না ঘটলে আমরা যে শিক্ষা-দীক্ষায় নিরন্তর পেছনে পড়ে থাকব-এ বিষয়ে তিনি বিশেষ সচেতন ছিলেন। বিদ্যার আদান-প্রদানের জন্য তিনি নিজ দেশে একটা বড় ক্ষেত্রের প্রত্যাশা করেন।

> অতএব, আমাদের দেশে বিদ্যাসমবায়ের একটি বড়ো ক্ষেত্র চাই, যেখানে বিদ্যার আদান প্রদান ও তুলনা হইবে, যেখানে ভারতীয় বিদ্যাকে মানবের সকল বিদ্যার ক্রমবিকাশের মধ্যে রাখিয়া বিচার করিতে হইবে।[৪৮]

ভারতবর্ষে বিদ্যার নদী বৈদিক, পৌরণিক, বৌদ্ধ, জৈন প্রধানত এ চারটি শাখায় প্রবাহিত বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। এর সঙ্গে মুসলিম বিদ্যা এসে মিশেছে। তিনি বলেছেন :

> বাহির হইতে মুসলমান যে জ্ঞান ও ভাবের ধারা এখানে বহন করিয়া আনিয়াছে সেই ধারা ভারতের চিত্তকে স্তরে স্তরে অভিষিক্ত করিয়াছে, তাহা আমাদের ভাষায় আচারে শিল্পে সাহিত্যে সংগীতে নানা আকারে প্রকাশমান।[৪৯]

এর সঙ্গে অবশেষে ইউরোপীয় বিদ্যার প্লাবন ঘটেছে। এ সবেরই একটি সমবায় সৃষ্টির কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। 'অতএব, আমাদের বিদ্যায়তনের বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান ও পার্সি বিদ্যার সমবেত চর্চায় আনুষঙ্গিকভাবে য়ুরোপীয় বিদ্যাকে স্থান দিতে হইবে।'[৫০]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক্ষেত্রে পৃথিবীর দেশে দেশে রাজনৈতিক দিক থেকে দানা বেঁধে উঠা উগ্র জাতীয়তাবাদকে ঘৃণা করেছেন। তিনি 'পলিটিক্যাল ঐক্য'–এর চেয়ে আরও মহত্তর ঐক্যের কথা চিন্তা করেছেন। আর 'সে ঐক্য চিত্তের ঐক্য, আত্মার ঐক্য।'[৫১]

এরূপ ঐক্যকেই তিনি ঐক্যের 'শাশ্বত ভিত্তি' হিসেবে গণ্য করেছেন। একেই সত্য 'ঐক্য চিত্তের ঐক্য' বলে আখ্যায়িত করেছেন। ভারতবর্ষেও এই ঐক্যকেই তিনি রাজনৈতিক ঐক্যের চেয়ে বড় করে জানার জন্য বলেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের শিক্ষায় ত্রুটির কারণে এমনটি হচ্ছে না বলে তিনি মন্তব্য করে বলেছেন :

> দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের বর্তমান শিক্ষা এমন যে, সেই শিক্ষার গুণেই ভারতীয় চিত্তকে আমরা তাহার স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেছি না। ভারতের হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমান শিখ পার্সি খৃস্টানকে এক বিরাট চিত্তক্ষেত্রে সত্যসাধনার যজ্ঞে সমবেত করাই ভারতীয় বিদ্যায়তনের প্রধান কাজ–ছাত্রদিগকে কেবল ইংরেজি মুখস্থ করানো, অঙ্ক কষানো, সায়ান্স শেখানো নহে।[৫২]

এখানে তিনি শিক্ষার ঐক্য সাধনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিভেদ দূর করে মানুষের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির ওপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির প্রয়াসও এখানে বিধৃত। বস্তুত বিদ্যাসমবায়ের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বের মানুষের আত্মার ও চিন্তার সমন্বয় বিধানের কথা বলেছেন। পৃথিবীতে মানুষে মানুষে বন্ধন সৃষ্টির কথা বলেছেন।

'শিক্ষার মিলন' (১৩২৮) প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বন্ধন সৃষ্টির ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি পরশ্রীকাতরতা ত্যাগ করতে বলেছেন। কারণ তাতে নিজের ভালো হয় না। পেছনে পড়ে থাকা ছাড়া সামনে এগুনো যায় না। নিজের ভাণ্ডার তাতে খালি হতেই থাকে। তিনি বলেছেন:

CamScanner

> ... এ কথা মানতেই হবে যে, আজকের দিনে পৃথিবীতে পশ্চিমের লোক জয়ী হয়েছে। পৃথিবীকে তারা কামধেনুর মতো দোহন করছে, তাদের পাত্র ছাপিয়ে গেল। আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছি, দিন দিন দেখছি আমাদের ভোগে অন্নের ভাগ কম পড়ে যাচ্ছে।[৫৩]

এ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে জীবনের মিলনের কথা বলেছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং ভারতবর্ষের আধ্যাত্ম শিক্ষার মিলন কামনা করেছেন। উগ্র মানসিকতার বশবর্তী হয়ে শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখার পক্ষপাতী নন তিনি। তিনি ঘোষণা করেছেন, এ জাতীয় 'স্বজাত্যের অহমিকা থেকে মুক্তিদান করার শিক্ষাই আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা।'[৫৪] শিক্ষাকে এক্ষেত্রেও তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যোগসূত্র স্থাপনের উপায় হিসেবে গণ্য করেছেন। 'আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতনকে পূর্বপশ্চিমের মিলননিকেতন ক'রে তুলতে হবে, এই আমার অন্তরের কামনা।'[৫৫] এভাবে রবীন্দ্রনাথকে আমরা বিশ্বমানবের মহামিলনের প্রবক্তা হিসেবে দেখি।

১৩৩০ সন থেকে শুরু করে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা বিষয়ে আরও নানা প্রবন্ধ রচনা করেছেন। অনেক ভাষণও দিয়েছেন। তবে এ পর্যায়ে রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শনে প্রয়োগবাদের ধারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর বিশেষত্ব হলো বাংলার পল্লি সমাজের উন্নয়নে শিক্ষা বিষয়ে তিনি মনোযোগ দিয়েছেন। এ কারণে ১৩২২ সনে তিনি 'পল্লী উন্নতি' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন।

১৩৩০ সনের পর পল্লি বিষয়ে তাঁর লেখাগুলোর মধ্যে 'পল্লী প্রকৃতি' (১৩৩৫), 'উপেক্ষিত পল্লী' (১৩৪৫), 'পল্লী সেবা' (১৩৪৬) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শুধু তাই নয় ১৩২৯ সনে (খ্রি: ১৯২২) তিনি 'শ্রীনিকেতনে পল্লী সংগঠন বিভাগ' গড়ে তোলেন। ১৩৩১ সনে (খ্রি: ১৯২৪) প্রতিষ্ঠা করেন 'পল্লী বিদ্যালয়' বা 'শিক্ষাসূত্র'। পল্লিবিষয়ক প্রবন্ধগুলোতে পল্লির সমস্যা নিরসনে রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে চিন্তা ভাবনা করেছেন। নানাবিধ প্রকল্প গ্রহণ করার কথাও বলেছেন। একটি প্রকল্পের বিষয়ে তিনি বলেছেন :

> আমার প্রস্তাব এই যে, বাংলাদেশের যেখানে হোক একটি গ্রাম আমরা হাতে নিয়ে তাকে আত্মশাসনের শক্তিতে সম্পূর্ণ উদ্‌বোধিত করে তুলি। সে গ্রামের রাস্তাঘাট, তার ঘরবাড়ির পরিপাট্য, তার পাঠশালা, তার সাহিত্যচর্চা ও আমোদপ্রমোদ, তার রোগীপরিচর্যা ও চিকিৎসা, তার বিবাদনিষ্পত্তি প্রভৃতি সমস্ত কার্যভার সুবিহিত নিয়মে গ্রামবাসীদের দ্বারা সাধন করাবার উদ্যোগ আমরা করি।[৫৬]

এরূপ প্রকল্প বাস্তবায়নের তিনি যথাযথ প্রশিক্ষিত কর্মীবাহিনীর গুরুত্ব অনুভব করেন। তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য তাঁর পরিকল্পনা হলো :

> যাঁরা এ কাজে প্রবৃত্ত হবেন তাঁদের প্রস্তুত করবার জন্যে আপাতত কলকাতায় একটা নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা আবশ্যক। এই বিদ্যালয়ে স্বেচ্ছাব্রতী শিক্ষকদের দ্বারা প্রজাস্বত্বসম্বন্ধীয় আইন, জমি-জরিপ ও রাস্তাঘাট ড্রেনপুকুর ঘরবাড়ি তৈরি, হঠাৎ কোনো সাংঘাতিক আঘাত প্রভৃতির উপস্থিত মত চিকিৎসা ও কৃষিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে মোটামুটি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকা কর্তব্য। পাশ্চাত্য দেশে গ্রাম প্রভৃতির আর্থিক ও অন্যান্য উন্নতি সম্বন্ধে আজকাল সে-সব চেষ্টার উদয় হয়েছে সে সম্বন্ধে সকলপ্রকার সংবাদ এই বিদ্যালয়ে সংগ্রহ করা দরকার হবে।[৫৭]

CamScanner

গ্রামীণ সমাজের উন্নয়ন বাদে বাংলার উন্নয়ন ভাবা যায় না। যে রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে ভেবেছিলেন ডিগ্রি অর্জন তথা জীবিকার বা চাকরির উপায় সন্ধান কখনো শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হতে পারে না, তাঁকেই মেনে নিতে হয়েছে ভারতবর্ষের দরিদ্র, ভদ্র সকল পরিবারের ছেলে-মেয়েদের জন্য সাংসারিক দায়ভার গ্রহণের প্রয়োজনে পরীক্ষা পাস বা ডিগ্রি আহরণের প্রয়োজনীয়তা। এজন্য তিনি তাঁর শ্রীনিকেতন, পল্লি বিদ্যালয় বা শিক্ষাসূত্র এর মাধ্যমে দরিদ্র গ্রামীণ শিক্ষার্থীদের সম্মুখে নিজেই উন্মুক্ত করেছেন জীবিকা উপার্জনের পথ। বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন বৈজ্ঞানিক কৃষিশিক্ষা, কাঠের ও চামড়ার কাজ, বয়ন ও কারুশিল্পের ওপর। টেকনোলজিকে তিনি করতে চেয়েছেন গ্রামভিত্তিক। কৃষি নির্ভর ভারতবর্ষের কথা স্মরণ রেখে তিনি নিজ পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত করার জন্য পাঠিয়েছিলেন সুদূর আমেরিকায়। সেই শিক্ষালব্ধ জ্ঞান কর্ষিত হয়েছে শিলাইদহ সুরুলের মতো প্রত্যন্ত পল্লি অঞ্চলে। বৃত্তিমূলক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সৌন্দর্য ও আনন্দের অন্বেষণে নন্দনতাত্ত্বিক শিক্ষায় সবসময় সবাইকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে শিক্ষাবিষয়ে প্রয়োগবাদী চিন্তার বিশেষ ঘনীভবন ঘটে ১৩৩৭ সনে (১৯৩০ খ্রি:) রাশিয়া ভ্রমণের মধ্যে দিয়ে। ১৩৩৮ সনে রাশিয়ার চিঠি গ্রন্থে তিনি রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা ও তার ফলাফলের নানাদিক তুলে ধরেন। রাশিয়াতে পৌঁছেই তিনি আশ্চর্য হয়ে গেছেন। কারণ 'আগাগোড়া সকল মানুষকেই এরা সমান করে জাগিয়ে তুলছে।'[৫৮]

রাশিয়ায় অবস্থানকালে তিনি সে দেশের শিক্ষার কাঠামো ও প্রকৃতি বিষয়ে যত পরিচিত হয়েছেন ততই মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি যেমন শিক্ষার কথা চিন্তা করেছেন সেখানে অনেকখানিই তাঁর দেখা পেয়েছেন। 'এখানে সেই শিক্ষা যে কী আশ্চর্য উদ্যমে সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হচ্ছে তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। শিক্ষার পরিমাণ শুধু সংখ্যায় নয়, তার সম্পূর্ণতায়, তার প্রবলতায়।'[৫৯]

তিনি তাঁর শ্রীনিকেতনে এ ধরনের শিক্ষাই আশা করেছেন। এজন্য রাশিয়ায় তাঁর কর্মীদের শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থার কথাও চিন্তা করেন। তবে রবীন্দ্রনাথের চোখে রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থার একটা মস্ত গলদ ধরা পড়ে।

> সংক্ষেপে সে গলদ হচ্ছে, শিক্ষাবিধি দিয়ে এরা ছাঁচ বানিয়েছে–কিন্তু ছাঁচে-ঢালা মনুষ্যত্ব কখনো টেকে না–সজীব মনের তত্ত্বের সঙ্গে বিদ্যার তত্ত্ব যদি না মেলে তা হলে হয় একদিন ছাঁচ হবে ফেটে চুরমার, নয় মানুষের মন যাবে মরে আড়ষ্ট হয়ে, কিংবা কলের পুতুল হয়ে দাঁড়াবে।[৬০]

রবীন্দ্রনাথ গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে এটি অনুভব করেছিলেন। তিনি এখানে ব্যক্তিসত্তার বিকাশের সাথে সমাজসত্তার বিকাশের পার্থক্য ও দ্বন্দ্ব লক্ষ করেন। সোভিয়েত রাশিয়ায় শিক্ষা ব্যক্তিকে যতখানি বিকশিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছিল, সমাজ কাঠামোকে ততখানিই কঠোর আবরণ দিয়ে মজবুত করা হয়েছিল। অনেকে মনে করেন, সোভিয়েত ব্যবস্থা ভেঙে যাওয়ার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কার সঠিকতা প্রমাণিত হয়েছে।

রাশিয়া থেকে ফিরে রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনের কর্মকাণ্ডে অধিকতর মনোযোগী হয়ে ওঠেন। তিনি উপলব্ধি করেন অজ্ঞতা-অন্ধতা-কুসংস্কার পীড়িত স্বদেশের জন্য এ পর্যায়ে শান্তিনিকেতনের চেয়ে শ্রীনিকেতনের বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ, কর্মপদ্ধতি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যুক্তিবাদী চিন্তার উপযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ।

পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষা বিষয়ক সকল লেখা ও অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার প্রায়োগিক দিক কমবেশি ওপরে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আদর্শিক, প্রকৃতিধর্মী ও মানবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গিও মেলে ধরেছেন। এ সবের মধ্যে 'বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ' (১৩৩৯),'শিক্ষার বিকিরণ' (১৩৪০), 'শিক্ষা ও সংস্কৃতি' (১৩৪২), 'ছাত্রসম্ভাষণ' (১৩৪৩) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ' অভিভাষণে (পরে লিখিত আকারে প্রকাশিত হয়) রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাব্যবস্থার ঐতিহ্যচ্যুতির বিষয়টি তুলে ধরেছেন। ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পূর্ব ঐতিহ্যধারা (নালন্দা-বিক্রমশিলা-তক্ষশিলায় বিদ্যমান) থেকে দূরে সরে এসেছে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চলছে ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাধারা। যেখানে রয়েছে অনুকরণের প্রাধান্য। এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি 'প্রাণের জিনিস নয়, শখের জিনিস'[৬১] হিসেবে অভিহিত করেছেন। ফলে তা সৃষ্টিশীলতা হারিয়ে ফেলছে। তাতে বিদ্যা আর চিত্তের সম্মিলন ঘটছে না। 'শিক্ষার বিকিরণ' প্রবন্ধে ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষার কৃত্রিমতার প্রতি তাঁর তীব্র নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। দীর্ঘকার থেকে প্রচলিত ভারতবর্ষের,বিশেষত বাংলাদেশের 'স্বৈচ্ছিক' জনশিক্ষার সঙ্গে সমাজের নাড়ির টানের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, তার স্বতঃসঞ্চার ছিল ঘরে ঘরে, যেমন রক্তচলাচল হয় সর্বদেহে।[৬২] এ শিক্ষার স্থলে আধুনিক শিক্ষার দাবি নিয়ে যে শিক্ষার প্রচলন ঘটেছে ব্রিটিশ বাংলা তাকে তিনি প্রকৃত আধুনিক শিক্ষা হিসেবে গণ্য করতে পারেন নি। তাঁর মতে এ শিক্ষার উৎপত্তি ও আকর্ষণ শহরকে কেন্দ্র করে। এ শিক্ষার ফলাফল থেকে গ্রাম বঞ্চিত।

> শহরবাসী একদল মানুষ এই সুযোগে শিক্ষা পেলে মান পেলে, অর্থ পেলে; তারাই হল এনলাইটেন্ড আলোকিত। সেই আলোর পিছনে বাকি দেশটাকে লাগল পূর্ণ গ্রহণ। ... কাংস্যবাদ্যমন্দ্রিত নাট্যমঞ্চের নেপথ্যে নিরানন্দ নিরালোক গ্রামে গ্রামে। নগরী হলো সুজলা, সুফলা, টানাপাখা-শীতলা, সেই খানেই মাথা তুললে আরোগ্যনিকেতন, শিক্ষার প্রাসাদ। দেশের বুকে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে এত বড়ো বিচ্ছেদের ছুরি আর কোনোদিন চালানো হয় নি, সে কথা মনে রাখতে হবে।[৬৩]

এ শিক্ষা দিয়ে শহর ও গ্রামের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। এটাকেই তিনি 'শিক্ষায় পরধর্ম' হিসেবে আখ্যায়িত করে এর মাধ্যমে যে কল্যাণসাধন হবে না তা নিশ্চিত করে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছেন। কোনো সভ্য দেশেই এই রকম অবস্থা বিরাজ করছে না বলেও তিনি মন্তব্য করেছেন। এ জাতীয় শিক্ষা সর্বজনীনরূপ পরিগ্রহ করার ক্ষমতা রাখে না বলে তা সমাজের একটা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে। এর মাধ্যমে সমাজের শ্রেনিবিভেদ ঘটছে, সৃষ্টি হচ্ছে সামাজিক অসাম্য যারা শিক্ষা লাভ করতে পারছে তারা যে পরিমাণে নিজেদেরকে বড় মনে করছে, সেই পরিমাণে অন্যদেরকে ছোটো ভাবছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> এক দিকে আমাদের দেশে সনাতন শিক্ষার ব্যাপ্তি রুদ্ধ হয়ে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের অনাবৃষ্টি চিরকালীন হয়ে দাঁড়ালো, অন্য দিকে আধুনিক কালের নতুন বিদ্যার যে আবির্ভাব হলো তার প্রবাহ বইল না সর্বজনীন দেশের অভিমুখে। পাথরে-গাঁথা কুণ্ডের মতো স্থানে স্থানে সে আবদ্ধ হয়ে রইল;... ইংরেজি শিখে যারা বিশিষ্টতা পেয়েছেন তাঁদের মনের মিল হয় না সর্ব সাধারণের সঙ্গে, দেশে সকলের চেয়ে বড়ো জাতিভেদ এখানেই শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃশ্যতা।[৬৪]

CamScanner

বস্তুত শিক্ষালাভ করে ব্যক্তি তার নিজের ও অন্যের মঙ্গল কামনা করবে, মঙ্গল সাধন করবে এটাই ছিল তাঁর কাম্য।

রবীন্দ্রনাথের 'আশ্রমের শিক্ষা' (১৩৪৩), 'বিশ্বপরিচয়' (১৩৪৪), 'সভ্যতার সংকট' (১৩৪৮) এবং অন্যান্য লেখা বিশেষত শিক্ষা ও সমাজ বিষয়ক লেখায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্যক্তি প্রসঙ্গ এসেছে।

বিশ শতকের শেষ প্রান্তে এসে বাংলাদেশের ও বাঙালি সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের মূল্য কতখানি-এ প্রশ্নের সম্মুখীন হলে অনেকদিন থেকেই তার পক্ষে জবাব দেওয়ার যুক্তি রয়েছে। প্রথমত, আমাদের সমাজে আজ আদর্শহীনতা গভীরভাবে বিরাজমান। ব্যক্তিস্বার্থের যূপকাষ্ঠে বলি হচ্ছে গোষ্ঠীস্বার্থ তথা সমাজস্বার্থ। সমাজের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যা আদর্শহীনতার এই সর্বনাশা করাল গ্রাস থেকে মুক্ত। দ্বিতীয়ত, আমাদের রাষ্ট্রীয় তথা নাগরিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আজ কৃত্রিমতার ছাপ স্পষ্ট। বিকৃত মানসিকতা, খণ্ডিত রাজনৈতিক চেতনাবোধ আমাদেরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এখানে রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে কৃত্রিম উপায়ে খণ্ডিত এবং চণ্ডতাপ্রবণ পশ্চাৎমুখী এক জাতীয়তার স্থান করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশ করেছে সন্ত্রাস, দলীয় রাজনীতির অসাধু ব্যবসা। ফলে আজ শিক্ষকের পেশাগত আদর্শচ্যুতি ঘটেছে, আর শিক্ষার্থীর নির্মল অধ্যবসায় থেকে দূরে সরে যাওয়ার নেতিবাচক ধারা বয়ে চলেছে। এখন ক্রমে রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে "দানে গ্রহণে আনন্দস্রোত, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর নিবিড় পরিচয় ও বন্ধনধারা, শিক্ষার সঙ্গে আমাদের সকল অংশের চিত্তের যোগ, শিক্ষার্থীর ভাষার সঙ্গে শিক্ষার ভাবের মিল। তৃতীয়ত, প্রকৃত সংস্কৃতিমান মানুষের সংখ্যা সমাজে কমে আসছে। বহুমুখী অপসংস্কৃতিয়ানের (diculturasation) ধারায় জাতি খেই হারাতে বসেছে। রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতিবোধসম্পন্ন মানুষের বিপরীত ধারার মানুষ সৃষ্টি হচ্ছে সমাজে যাদের মধ্যে উদ্ধারের বিনয়কৌশল বেশি, নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেয়ে নিজেকে হেয় করার প্রবণতা বেশি। চতুর্থত, গোটা দেশ জুড়ে আজ চলছে মনুষ্যত্বের সংকট। এই মনুষ্যত্বহীনতার ফলে সমাজে তীব্রভাবে সৃষ্টি হচ্ছে সামাজিক বৈষম্য, লিঙ্গ বিভেদ, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এবং রাহাজানি ও ধর্ষণের মতো অন্যান্য মারাত্মক সব অপরাধ। পঞ্চমত, সমাজে প্রাতিষ্ঠানিক ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা আজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্দেহের সম্মুখীন হচ্ছে। ষষ্ঠত, আজও আমাদের দেশে শহর-গ্রাম সম্পর্ক তীব্রভাবে নেতিবাচক। জীবনযাত্রার মান, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তর ব্যবধান। সর্বোপরি সমাজে শিক্ষার গুণগত ও পরিমাণগত প্রসারের ক্ষেত্রসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে নানাবিধ সংকট বিদ্যমান রয়েছে।

এ রকম আরও অনেক দিক তুলে ধরা চলে যে সবের পটভূমিতে রবীন্দ্র শিক্ষাচিন্তার সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের জন্য আজও অনেকখানিই তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর মৃত্যু হয়েছে (১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) অনেক বছর হলো। আজও ব্যক্তি এবং জাতীয় সংকটে আমরা বার বার রবীন্দ্রনাথের নিকট ফিরে যাই। শুধু আমাদের জন্য নয়, গোটা বিশ্বসভ্যতার জন্যই তা সত্য। কতখানি কখন নেওয়া প্রয়োজন, সেটা আপেক্ষিক বিষয়, সব সময়ই যে কিছু নেওয়া প্রয়োজন তাতে সন্দেহ নেই। কারণ 'ব্যক্তিমানুষ' যতদিন থাকবে ততদিনই 'মানব সমাজ' থাকবে। আর মানবসমাজ ও সভ্যতার সংকটে মনুষ্যত্বের আদর্শ তুলে ধরাই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-সমাজ দর্শন এই শিক্ষাই আমাদের দিচ্ছে।

CamScanner

তথ্যসূত্র

১. 'শিক্ষার হের ফের', শিক্ষা, রবীন্দ্র রচনাবলী ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ: ৫৬৫
২. পূর্বোক্ত পৃ: ৫৬৫
৩. পূর্বোক্ত পৃ: ৫৬৬
৪. পূর্বোক্ত পৃ: ৫৬৬
৫. পূর্বোক্ত পৃ: ৫৬৬
৬. পূর্বোক্ত পৃ: ৫৬৬
৭. পূর্বোক্ত পৃ: ৫৬৬-৬৭
৮. পূর্বোক্ত পৃ: ৫৬৭
৯. পূর্বোক্ত পৃ: ৫৭০
১০. পূর্বোক্ত পৃ: ৫৭০
১১. 'প্রসঙ্গ কথা' পূর্বোক্ত পৃ: ৭১৪
১২. পূর্বোক্ত পৃ: ৭১৪
১৩. পূর্বোক্ত পৃ: ৭১৪-১৫
১৪. পূর্বোক্ত পৃ: ৭১৫
১৫. 'স্বাধীন শিক্ষা' পূর্বোক্ত পৃ: ৭২৩-২৪
১৬. 'শিক্ষা সংস্কার' পূর্বোক্ত পৃ: ৫৭৪
১৭. পূর্বোক্ত পৃ: ৫৭৪-৭৫
১৮. পূর্বোক্ত পৃ: ৫৭৫
১৯. পূর্বোক্ত পৃ: ৫৭৫
২০. পূর্বোক্ত পৃ: ৫৭৫-৫৭৬
২১. 'শিক্ষাসমস্যা' পূর্বোক্ত পৃ: ৫৭৭-৫৭৮
২২. পূর্বোক্ত পৃ: ৫৭৮
২৩. পূর্বোক্ত পৃ: ৫৭৮
২৪. পূর্বোক্ত পৃ: ৫৭৯-৫৮০
২৫. পূর্বোক্ত পৃ: ৫৮১
২৬. পূর্বোক্ত পৃ: ৫৮১
২৭. পূর্বোক্ত পৃ: ৫৮১
২৮. পূর্বোক্ত পৃ: ৫৮২
২৯. 'জীবনস্মৃতি' রবীন্দ্র রচনাবলী নবম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৌষ ১৪১৭, পৃ: ৪১৭
৩০. পূর্বোক্ত পৃ: ৪২২
৩১. পূর্বোক্ত পৃ: ৪৩৩
৩২. পূর্বোক্ত পৃ: ৪৩৩
৩৩. 'ছেলেবেলা' রবীন্দ্র রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, বৈশাখ ১৪১৭ পৃ : ৭১১
৩৪. 'লক্ষ্য ও শিক্ষা' পথের সঞ্চয়, রবীন্দ্র রচনাবলী পূর্বোক্ত পৃ: ৬৯৯

CamScanner

৩৫. পূর্বোক্ত পৃ: ৭০০
৩৬. পূর্বোক্ত পৃ: ৭০০
৩৭. পূর্বোক্ত পৃ: ৭০০-৭০১
৩৮. 'স্ত্রীশিক্ষা', রবীন্দ্র শিক্ষাভাবনা সমগ্র, সংগ্রহ ও সম্পাদনা, শোয়াইব জিবরান, সংবেদ, ফেব্রুয়ারি ২০১২, ঢাকা পৃ: ৬৯
৩৯. পূর্বোক্ত পৃ: ৬৯
৪০. পূর্বোক্ত পৃ: ৭০
৪১. 'নারী', কালান্তর, রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, পৌষ ১৪১৭ পৃ: ৬২৫
৪২. পূর্বোক্ত পৃ: ৬২৫
৪৩. 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ', রবীন্দ্র শিক্ষাভাবনা সমগ্র, শোয়াইব জিবরান, পূর্বোক্ত, পৃ: ১১৯
৪৪. পূর্বোক্ত পৃ: ১২২
৪৫. পূর্বোক্ত পৃ: ১২১
৪৬. পূর্বোক্ত পৃ: ১১৯
৪৭. 'শিক্ষাসমবায়', রবীন্দ্র শিক্ষাভাবনা সমগ্র, শোয়াইব জিবরান, পূর্বোক্ত, পৃ: ৯২
৪৮. পূর্বোক্ত পৃ: ৯২
৪৯. পূর্বোক্ত পৃ: ৯৩
৫০. পূর্বোক্ত পৃ: ৯৩
৫১. পূর্বোক্ত পৃ: ৯৩
৫২. পূর্বোক্ত পৃ: ৯৩
৫৩. 'শিক্ষার মিলন', রবীন্দ্র শিক্ষাভাবনা সমগ্র, শোয়াইব জিবরান, পূর্বোক্ত, পৃ : ৯৪
৫৪. পূর্বোক্ত পৃ: ১০০
৫৫. পূর্বোক্ত পৃ: ১০০
৫৬.'পল্লীর উন্নতি', পল্লী প্রকৃতি, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, পৌষ ১৪১৭ পৃ : ৩৫৮
৫৭. পূর্বোক্ত পৃ: ৩৫৮
৫৮. 'রাশিয়ার চিঠি', রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, পৌষ ১৪১৭ পৃ: ৫৫৫
৫৯. পূর্বোক্ত পৃ: ৫৫৬
৬০. পূর্বোক্ত পৃ: ৫৫৬
৬১.'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ', শিক্ষা, রবীন্দ্র রচনাবলী, অষ্টাবিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, পৌষ ১৪০২ পৃ: ৪৪০
৬২. 'শিক্ষার বিকিরণ' রবীন্দ্র শিক্ষাভাবনা সমগ্র, শোয়াইব জিবরান, পূর্বোক্ত পৃ: ১১২
৬৩. পূর্বোক্ত পৃ: ১১২-১১৩
৬৪. পূর্বোক্ত পৃ: ১১৪

CamScanner

বাকী বিল্লাহ বিকুল*

রবীন্দ্রনাথের ত্রয়ী প্রবন্ধে শিক্ষাভাবনা

সারসংক্ষেপ : *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের বিস্ময়কর প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ। সাহিত্যের সব শাখায় তাঁর বিচরণ সফলতায় সমৃদ্ধ। প্রবন্ধসাহিত্যে রয়েছে তাঁর বিশেষ খ্যাতি। নানাবিধ প্রবন্ধ রচনায়–সমালোচনা সাহিত্যে তিনি মনোনিবেশ করেছিলেন। সেক্ষেত্রে শিক্ষা-বিষয়ক প্রবন্ধ এক মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। রবীন্দ্র-প্রবন্ধের ভেতরে রবীন্দ্র-ত্রয়ী প্রবন্ধ 'শিক্ষার হেরফের', শিক্ষার বাহন' ও 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধগুলো বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রবন্ধ-ত্রয়ীতে শুধু তাঁর শিক্ষা ভাবনাই নয়, রয়েছে এর পিছনে নানাবিধ ঘটনা। একদিকে প্রবন্ধগুলোতে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-মানস, অন্যদিকে এই প্রবন্ধগুলো ঘিরে নানাবিধ ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। তারই এক অনুপুঙ্খ বর্ণনা তুলে ধরার প্রয়াস এ-প্রবন্ধে বিদ্যমান।*

রূপ এবং রূপান্তরের ভেতরে বিধৃত রবীন্দ্র-জীবন। বাংলা সাহিত্যে সর্বত্র বিচরণকারী দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সুদক্ষ শিল্পী, বিস্ময়কর প্রতিভার নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। যেখানে তাঁর হাতের স্পর্শ পড়েছে, সেখানেই ফলেছে সোনার ফসল। তাঁর সৃষ্টিশিল্পের বিশেষ বিশেষ ভাবনার পরিচয় কাব্যে-নাটকে-গানে-উপন্যাসে দেখতে পাই। সেখানে তিনি আনন্দের নতুন উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। তেমনি প্রবন্ধের ক্ষেত্রে আনন্দের নতুন উপকরণ আবিষ্কার করেছেন এবং আমাদের চিন্তার-ভাবনার আগ্রহকে বর্তমানকে কেন্দ্র করে অতীত হতে ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত করে দিয়েছেন। রবীন্দ্র-প্রতিভাকে সুবিশাল বনস্পতির সঙ্গেই কেবল তুলনা করা চলে।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসাহিত্য যেন যোজন-বিস্তৃত মহাসমুদ্রের মতই; তার পরিধি যেমন ব্যাপক তার গভীরতা তেমন অগাধ। শিক্ষা, ধর্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি, দর্শন, আধ্যাত্মিকতা, বিজ্ঞান, আত্মকথা, সাহিত্য সমালোচনা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর অনেকগুলো শিক্ষা সম্পর্কিত প্রবন্ধ রয়েছে যেখানে তাঁর শিক্ষা বিষয়ে মৌলিক চিন্তার পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। এ সমস্ত প্রবন্ধে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব কতকগুলো আদর্শ ও চিন্তা প্রতিফলিত হয়েছে। প্রবন্ধে উপস্থাপিত রবীন্দ্র-ভাবনাগুলো সমসাময়িক কালের পটভূমিকায় মৌলিক ও একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল, তাতে কোনো সংশয় নেই। বিস্ময়কর যা তাহলো, রবীন্দ্রনাথের ত্রয়ী প্রবন্ধ 'শিক্ষার হেরফের', শিক্ষার মিলন' ও 'শিক্ষার বাহন'-এর আবেদন এখনো ফুরিয়ে যায় নি।

*সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ

CamScanner

ত্রয়ী প্রবন্ধে রবীন্দ্র-মানস

শিক্ষা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে। তিনি মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে ১৮৯২ সালে এই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন :

> এই সময়ে রাজশাহীতে আছেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, যিনি 'সিরাজদ্দৌলা' ও 'মীর কাসেম' সম্বন্ধে বই লিখে অমর হয়েছেন। আছেন আরো অনেক সাহিত্যিক। তাঁদের অনুরোধে 'শিক্ষার হেরফের' নামে প্রবন্ধ লিখে রবীন্দ্রনাথ 'রাজশাহী এসোসিয়েশন'-এ পাঠ করলেন।[১]

প্রশান্তকুমার পাল 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধ প্রকাশের ইতিহাস বিবৃত করেছেন এভাবে –

> রামপুর বোয়ালিয়াতে থাকার সময়ে রবীন্দ্রনাথ 'রাজশাহী অ্যাসোসিয়েশনে'র উদ্যোগে রাজশাহী কলেজে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'শিক্ষার হেরফের' পাঠ করেন। নাটোরের মহারাজা ছিলেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি। সম্ভবত তাঁরই অনুরোধে সেখানে পাঠ করার জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি রচনা করেন।[২]

উল্লেখ্য যে, পৌষ সংখ্যা সাধনায় 'শিক্ষার হেরফের' প্রকাশিত হওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসুকে পত্র লিখে প্রবন্ধটি সম্বন্ধে তাদের মূল্যবান মতামত প্রত্যাশা করেছিলেন।

> পৌষ মাসের সাধনায় প্রকাশিত 'শিক্ষার হেরফের' নামক প্রবন্ধের প্রতি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। আমার একান্ত বিশ্বাস স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষার অভাবেই আমাদের দেশের যথেষ্ট উন্নতি হইতেছে না। এ সম্বন্ধে আপনার কি মত জানিতে পারিলে বাধিত হইব। যদি মতের অনৈক্য না থাকে তবে কি উপায় অবলম্বন করিলে ইহার প্রতিকার হইতে পারে যদি অবসর মত জানান তবে চরিতার্থ হইব।[৩]

পরবর্তীতে পত্রবাহকেরা প্রবন্ধের লেখক তাঁর বলিষ্ঠ-যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে পত্র দিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য দেশের সাধারণ জনগণ এই প্রবন্ধের মাহাত্ম বুঝতে পারে নি, তারা এ-বিষয়ে কোনো সাড়াও দেয় নি। আর তৎকালীন ইংরেজ সরকারের কাছে এটা পিঠে চাবুক মারার মতো মনে হয়েছিল।

বাংলাদেশের মানুষের শিক্ষার পদ্ধতি কী হওয়া উচিত, রবীন্দ্রনাথ এ-বিষয়ে তাঁর নানা লেখা, আলোচনা-সভা-সেমিনার-বক্তৃতায়, বৈচিত্র্যময় চিন্তায় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়ে এটিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ। দুঃখের-পরিতাপের বিষয় সে সময়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচিতে ব্যবহৃত ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক প্রভৃতির শিক্ষার বাহন ছিল ইংরেজি। রবীন্দ্রনাথ এ-প্রবন্ধে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার বিরোধিতা করেন নি। তিনি বলতে চেয়েছেন, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাই শিক্ষার্থীর পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন :

> কিন্তু আমাদের বর্তমান শিক্ষায় সে পথ একপ্রকার রুদ্ধ। আমাদিগকে বহুকাল পর্যন্ত শুদ্ধমাত্র ভাষা শিক্ষায় ব্যাপৃত থাকিতে হয়। পূর্বেই বলিয়াছি ইংরেজি এতই বিদেশীয় ভাষা এবং আমাদের শিক্ষকেরা সাধারণত এত অল্পশিক্ষিত যে, ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ভাব আমাদের মনে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। এইজন্য ইংরেজি ভাবের সহিত কিয়ৎপরিমাণে পরিচয় লাভ করিতে আমাদিগকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হয় এবং ততক্ষণ আমাদের চিন্তাশক্তি নিজের উপযুক্ত কোনো কাজ না পাইয়া নিতান্ত নিশ্চেষ্টভাবে থাকে। এন্ট্রেন্স এবং ফার্স্ট-আর্টস পর্যন্ত কেবল চলনসই রকমের ইংরেজি শিখিতেই যায়–; তার পরেই সহসা বি.এ. ক্লাসে বড়ো বড়ো পুঁথি এবং গুরুতর চিন্তাসাধ্য প্রসঙ্গ আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া হয়–তখন সেগুলা ভালো করিয়া আয়ত্ত করিবার সময়ও নাই শক্তিও নাই–সবগুলা মিলাইয়া এক-একটা বড়ো বড়ো তাল পাকাইয়া একেবারে এক-এক গ্রাসে গিলিয়া ফেলিতে হয়।[৪]

CamScanner

গোটা বাংলাভাষী অঞ্চলের লোকজন যখন বাংলা ছেড়ে ইংরেজি রচনার মোহে অন্ধ, সে ভাষার প্রশংসায় পঞ্চমুখ তখন রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন এই প্রবন্ধ। বিশেষত বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের সুপারিশকৃত লেখা ছিল তখন অত্যন্ত সাহসিকতার এক অনন্য নজির। বাংলা ভাষা শিক্ষা ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে এমন সুচিন্তিত মতামতের প্রবন্ধ বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে দুর্লভ। প্রবন্ধে উদ্ধৃতিতে তা ধরা পড়ে।

> এইরূপে বিশ-বাইশ বৎসর ধরিয়া আমরা যে-সকল ভাব শিক্ষা করি আমাদের জীবনের সহিত তাহার একটা রাসায়নিক মিশ্রণ হয় না বলিয়া আমাদের মনের ভারি-একটা অদ্ভুত চেহারা বাহির হয়। শিক্ষিত ভাবগুলি কতক আটা দিয়া জোড়া থাকে, কতক কালক্রমে ঝরিয়া পড়ে। অসভ্যেরা যেমন গায়ে রঙ মাখিয়া উলকি পরিয়া পরম গর্ব অনুভব করে, স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের উজ্জ্বলতা এবং লাবণ্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, আমাদের বিলাতি বিদ্যা আমরা সেইরূপ গায়ের উপর লেপিয়া দম্ভভরে পা ফেলিয়া বেড়াই, আমাদের যথার্থ আন্তরিক জীবনের সহিত তাহার অল্পই যোগ থাকে।[৫]

রবীন্দ্রনাথ দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক ত্রুটি আবিষ্কার করে লিখেছিলেন ত্রুটিবহুল নীরস শিক্ষা-পদ্ধতির কথা। আর যে কারণে শিক্ষার্থীদের সমগ্র ব্যক্তিসত্তার সর্বাঙ্গীন বিকাশও সাধন হয় না বলেও তিনি মনে করেছিলেন। বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে নেই কোনো আনন্দ, নেই বৈচিত্র্যময়তা আর না আছে জীবনমুখী চিন্তা। যার ফলে সেই ধরনের শিক্ষা শিক্ষার্থীর হৃদয় ও স্বভাবের সঙ্গে কোনোদিনই সুষ্ঠু সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে পারে না–কেবল মানসিক শক্তিই ক্ষয় করে। রবীন্দ্রনাথকে এগুলো পীড়িত করেছিল। যে-কারণে তিনি গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন :

> বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা-কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমনি করিয়া কোনোমতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু বিকাশ লাভ হয় না। হাওয়া খাইলে পেট ভরে না, আহার করিলে পেট ভরে, কিন্তু আহারটি রীতিমত হজম করিবার জন্য হাওয়া খাওয়া দরকার। তেমনি একটা শিক্ষাপুস্তককে রীতিমত হজম করিতে অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য আবশ্যক। আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; গ্রহণশক্তি চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে বললাভ করে।[৬]

রবীন্দ্রনাথ কেবল একজন বিশ্বখ্যাত কবিই ছিলেন না, তিনি দেশের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাপ্রণেতাও ছিলেন। যথার্থ শিক্ষা জাতির জীবন ও চরিত্রের ভিত্তিস্বরূপ, অর্থাৎ প্রকৃত শিক্ষা ব্যতীত মানুষ সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। শিক্ষাই মানবজাতির বুদ্ধিবৃত্তিরসমূহ বিকাশ ও চরম চিত্তোৎকর্ষ সাধনে সহায়ক হয় এবং মানুষের সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনা করে। সে-কারণে রবীন্দ্রনাথ দেশ ও জাতির শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে শিক্ষোৎসাহী হয়ে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার বাহন' শিক্ষা সম্পর্কিত আর এক বিশেষ প্রবন্ধ। এ-প্রবন্ধ সম্পর্কে একজন গবেষক উল্লেখ করেছেন :

> এই সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-কমিশন আসছে, দেশের সর্বত্র শিক্ষা নিয়ে আলোচনা চলছে। কবির মনে নানা প্রশ্ন জাগছে দেশ সম্বন্ধে; তার মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও শিক্ষাসমস্যার কথাই বেশি। তাই লিখলেন 'শিক্ষার বাহন'; কলকাতায় ফিরে রামমোহন লাইব্রেরির হলে প্রবন্ধটি পড়লেন (১০ ডিসেম্বর ১৯১৬)। কবির বক্তব্য–দেশীয় ভাষার আধারে যাবতীয় জ্ঞানবিজ্ঞান দেশের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। এ কথা তাঁর নূতন নয়–তবুও নূতন করে নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বিষয়টাকে স্পষ্ট করে ধরলেন। বাংলা দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে ইংরেজি ও বাংলার দুটি ধারা সৃষ্টি করার সুপারিশ করে তিনি বললেন, সাদা কালো দুই স্রোতের গঙ্গা-যমুনা-ধারায় বিভাগ থাকলেও তারা এক সঙ্গেই বয়ে চলবে।[৭]

CamScanner

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে এসেছিলেন কেবল বিশ্রামের জন্যই নয়, অন্য গুরুতর নানা বিষয়ে এখানে প্রয়োজন সংঘটিত হয়েছিল। এখানে পল্লীসংগঠন কাজে যেমন মনোযোগী হয়ে উঠেছিলেন, তেমনি লেখার জগৎটাও হয়ে উঠেছিল পরম আনন্দময়। রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ বাসের ফল তাঁর 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধটি। এ-প্রসঙ্গে প্রশান্তকুমার পাল উল্লেখ করেছেন :

> ঘরে-বাইরে-র অগ্র-কিস্তি ছাড়া রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধটিও লেখেন। ডাঃ ওয়াটসন শিক্ষার মান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পরীক্ষাপদ্ধতি কঠোর করার প্রস্তাব করলে রবীন্দ্রনাথ 'টীকাটিপ্পনীতে তার প্রতিবাদ করেছিলেন। বিহার প্রদেশের লেফটেনান্ট গবর্নর বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিস্থাপন করতে গিয়ে অট্টালিকাদি শিক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় বলে ঘোষণা করেছেন জেনে তিনি এই প্রবন্ধে তার প্রতিবাদ করলেন। তিনি নিজে শান্তিনিকেতনে মাঠের মধ্যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন–অনাড়ম্বরতাই তার বৈশিষ্ট্য। এই কারণে ছোটো লাটের মন্তব্যটিতে তিনি পীড়া বোধ করেছেন। অবশ্য এটি প্রবন্ধের মূল বক্তব্য নয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে ড. আশুতোষ মুখোপাধ্যায় দেশ-বিদেশের বহু পণ্ডিতকে আহ্বান করে আনছিলেন, সিনেট হলে প্রদত্ত এই বক্তৃতাগুলিতে জনসাধারণেরও প্রবেশাধিকার ছিল। ড. দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী ভাইস-চ্যান্সেলর হয়ে এই রীতি অব্যাহত রাখেন। সিন্ডিকেট রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে এইরূপ বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে।[৮]

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য তাঁদের এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নি, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রয়াসের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন তাঁর 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে।

আজকাল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা প্রশস্ত পরিমণ্ডল তৈরি হইয়া উঠিতেছে। একদিন মোটের উপর ইহা একজামিন-পাসের কুস্তির আখড়া ছিল। এখন আখড়ার বাহিরেও ল্যাঙটার উপর ভদ্রবেশ ঢাকা দিয়া একটু হাঁফ ছাড়িবার জায়গা করা হইয়াছে। কিছুদিন হইতে দেখিতেছি বিদেশ হইতে বড়ো বড়ো অধ্যাপকেরা আসিয়া উপদেশ দিতেছেন, এবং আমাদের দেশের মনীষীদেরও এখানে আসন পড়িতেছে। শুনিয়াছি বিশ্ববিদ্যালয়ের এইটুকু ভদ্রতাও আশু মুখুজ্যেমশায়ের কল্যাণে ঘটিয়াছে।[৯]

'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার এই প্রস্তুতকৃত ক্ষেত্রটিকে এই প্রবন্ধে আরও প্রসারিত করবার জন্য সুপারিশ করেছিলেন।

> মানুষের পক্ষে অন্নেরও দরকার থালারও দরকার এ কথা মানি কিন্তু গরিবের ভাগ্যে অন্ন যেখানে যথেষ্ট মিলিতেছে না সেখানে থালা সম্বন্ধে একটু কষাকষি করাই দরকার। যখন দেখিব ভারত জুড়িয়া বিদ্যার অন্নসত্র খোলা হইয়াছে তখন অন্নপূর্ণার কাছে সোনার বালা দাবি করিবার দিন আসিবে। আমাদের জীবন যাত্রা গরিবের অথচ আমাদের শিক্ষার বাহ্যাড়ম্বরটা যদি ধনীর চালে হয় তবে টাকা ফুঁকিয়া দিয়া টাকার থলি তৈরি করার মতো হইবে।[১০]

বাংলার শিক্ষাব্যবস্থার এ-সমস্ত ত্রুটি ধরে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এসব নিয়ে বাঙালিরা তেমন মাথা ঘামায় নি, প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শন তারা বুঝতে পারেন নি। মাতৃভাষার প্রতি তাদের দরদ তৈরি হয় নি। এক্ষেত্রে তাই প্রাবন্ধিকের দুঃখ-ক্ষোভ ঝরে পড়েছে প্রবন্ধে।

CamScanner

> মাতৃভাষা বাংলা বলিয়াই কি বাঙালিকে দণ্ড দিতেই হইবে? এই অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য সে চিরকাল অজ্ঞান হইয়াই থাক্–সমস্ত বাঙালির প্রতি কয়জন শিক্ষিত বাঙালির এই রায়ই কি বহাল রহিল? যে বেচারা বাংলা বলে সেই কি আধুনিক মনুসংহিতার শূদ্র? তার কানে উচ্চশিক্ষার মন্ত্র চলিবে না? মাতৃভাষা হইতে ইংরেজি ভাষার মধ্যে জন্ম লইয়া তবেই আমরা দ্বিজ হই?[১১]

রবীন্দ্রনাথ ইতোপূর্বে আলোচিত 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধের সময় থেকেই তিনি শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করার উপযোগিতা বিষয়ে প্রচার চালিয়ে আসছিলেন। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে তার কার্যকারিতাও পরীক্ষা করে দেখেছেন। ইংরেজি ভাষা শিক্ষা বিষয়ে তাঁর কোনো নেতিবাচক মনোভাব ছিল না। এ-প্রবন্ধেও তিনি তাই ব্যক্ত করেছেন :

> এমনি করিয়া বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি এবং বাংলা ভাষার ধারা যদি গঙ্গাযমুনার মতো মিলিয়া যায় তবে বাঙালি শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান হইবে। দুই স্রোতের সাদা এবং কালো রেখার বিভাগ থাকিবে বটে কিন্তু তারা একসঙ্গে বহিয়া চলিবে। ইহাতেই দেশের শিক্ষা যথার্থ বিস্তীর্ণ হইবে, গভীর হইবে, সত্য হইয়া উঠিবে।[১২]

তারপরেও বাংলা ভাষার জন্য তাঁর একান্ত দরদ। ক্ষোভ ঝরে পড়েছে প্রবন্ধের অক্ষরে :

> ইংরেজি রাস্তাটার দিকেই বেশি লোক ঝুঁকিবে তা জানি; এবং দুটো রাস্তার চলাচল ঠিক সহজ অবস্থায় পৌঁছিতে কিছু সময়ও লাগিবে। রাজভাষার দর বেশি সুতরাং আদরও বেশি। কেবল চাকরির বাজারে নয়, বিবাহের বাজারেও বরের মূল্যবৃদ্ধি ঐ রাস্তাটাতেই। তাই হোক–বাংলা ভাষা অনাদর সহিতে রাজি, কিন্তু অকৃতার্থতা সহ্য করা কঠিন। ভাগ্যমন্তের ছেলে ধাত্রীস্তন্যে মোটাসোটা হইয়া উঠুক–না কিন্তু গরিবের ছেলেকে তার মাতৃস্তন্য হইতে বঞ্চিত করা কেন?[১৩]

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাসম্বন্ধীয় প্রতিটি প্রবন্ধই চিন্তার প্রসার, গভীরতা ও প্রত্যয়ঘনতায় সমুজ্জ্বল হয়েছে। বিশেষত তাঁর ত্রয়ী প্রবন্ধে এ-বিষয়গুলো আরো দৃঢ়পিনদ্ধ। এ-ক্ষেত্রে তার 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধ আর এক উজ্জ্বল উদাহরণ। প্রবন্ধটির প্রকাশনার ইতিহাস সম্পর্কে 'প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়' উল্লেখ করেছেন।

> কবি যখন বিদেশে (১৯০২০-২১) সে সময়ে ভারতে আরম্ভ হয়েছে প্রথম অসহযোগ আন্দোলন। ইংরেজ-সরকার-প্রভাবিত বিদ্যালয়, আদালত, আপিস সবই বর্জন করবার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন গান্ধীজি। এ ভাবে অসহযোগ চালাতে পারলে এক বৎসরের মধ্যে নাকি স্বরাজ লাভ হবে। দেশে ফিরে কবি দেখেন শান্তিনিকেতন অসহযোগ-আন্দোলনের একটা বড়োরকম কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। কস্মিনকালেও যাঁরা রাজনীতিচর্চা করেননি তাঁরাই আজ অগ্রণী; এক বৎসরে স্বরাজ-লাভের আশায় সকলেই উৎসুক। কবি দেশে দেশে ফিরছেন বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগসূত্রের সন্ধানে, শান্তিনিকেতনকে সর্বমানবের মিলনতীর্থ করবেন এই কল্পনা মনে নিয়ে, আর সেখানেই অধ্যাপক-ছাত্র-মিত্র মিলে একটা 'সংকট' সৃষ্টি করে তুলেছেন অসহযোগের–একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস! গান্ধীজী শিক্ষালয় বয়কট করবার কথা বলেছিলেন এক বৎসরের জন্য। কথাটা নূতন নয়, পদ্ধতিও পুরোনো। কিন্তু আশানুরূপ ফললাভ হবে কি? জাতির চিন্তার আকাশকে কুয়াশামুক্ত করবার আকাঙ্খায় রবীন্দ্রনাথ য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে (১৫ আগস্ট ১৯২১) একটি প্রবন্ধ পাঠ করলেন– 'শিক্ষার মিলন'। কবির মতে য়ুরোপ যে জয়ী হয়েছে সে তার বিদ্যার জোরে; সেই বিদ্যাকে গাল পাড়তে থাকলে দুঃখ কমবে না, কেবল অপরাধই বাড়বে। কবি বললেন, আসলে বুদ্ধির ভীরুতাই হচ্ছে শান্তিহীনতার মূলে। স্বাজাত্যের অহমিকা থেকে মুক্তিলাভই শিক্ষার আসল লক্ষ্য; আমাদের দেশের বিদ্যায়তনগুলিকে পূর্ব-পশ্চিমের মিলনকেন্দ্র করে তুলতে হবে।[১৪]

CamScanner

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে রচিত ও নানাদিক নিয়ে আলোচিত রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধ সম্পর্কে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

> ...গত শনিবার [৬ আগষ্ট] কলাভবনে পূজনীয় গুরুদেব 'শিক্ষার মিলন' নামক প্রবন্ধটি পাঠ করেন। তৎপর তিনি উক্ত বিষয়ে উপস্থিত সভ্যমহোদয়গণের সহিত কিঞ্চিৎ আলোচনা করেন।...বর্ষাসংগীত অনুষ্ঠানের পরে ২৯ শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় গেলেন। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী এইদিন 'শিক্ষার মিলন' পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।... পনেরো আগষ্ট য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট হলে আশুতোষ চৌধুরীর সভাপতিত্বে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কবি-সংবর্ধনার আয়োজন করেছিল। রবীন্দ্রনাথ সেই অনুষ্ঠানে 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধটি পাঠ করলেন। ... 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধটি পুস্তিকা ছাড়াও ভাদ্র-সংখ্যা সবুজ পত্র এবং আশ্বিন-সংখ্যা প্রবাসী ও ভারতী-তে মুদ্রিত হয়।[১৫]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহুল আলোচিত এই প্রবন্ধ পাঠ নিয়ে সে সময় নানা উত্তেজকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। এ-প্রসঙ্গে যা জানা যায় তাহলো :

> অনুষ্ঠানটির জন্য যদিও আমন্ত্রণপত্রের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু বিপুল জনতা প্রবেশাধিকারের আশায় দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সত্ত্বেও দুপুর বারোটা থেকেই হলের সামনে সমবেত হতে আরম্ভ করে। বিকেল চারটের মধ্যেই বিশাল হলটি তার ব্যালকনি ও করিডর-সমেত জনাকীর্ণ হয়ে যায়। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ প্রবেশদ্বারের কাছে জনতার চাপে শৃঙ্খলা বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। ঠিক সেই সময়ে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত হলে ছাত্রেরা প্রবেশাধিকার পাওয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ করতে থাকে। অনেক কষ্টে পিছনের একটি দরজা দিয়ে তিনি ভিতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হন। পৌনে ছ'টা নাগাদ আশুতোষ চৌধুরী ও অ্যান্ডরুজকে সঙ্গে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সভাস্থলে আসেন। তাঁকে দেখেই জনতা আরও উত্তাল হয়ে উঠে জোর করে ভিতরে প্রবেশ করতে গিয়ে অনেকগুলি কাঁচের শার্সি ভেঙে ফেলে। ভিতরে আর তিল ধারণের জায়গাও ছিল না। রবীন্দ্রনাথ হলের ভিতর প্রবেশ করলে সমাগত সকলে উঠে দাঁড়িয়ে হর্ষধ্বনি করে তাঁকে স্বাগত জানান। আশুতোষ চৌধুরী তাঁকে মাল্যভূষিত করে বলেন, রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি জার্মানি, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশ ও সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেখে এসেছেন। তিনি বহুদিন ধরেই জাতীয় শিক্ষার পন্থাপদ্ধতি নিয়ে চিন্তা করেছেন। এখন তাঁর মুখ থেকেই জাতীয় শিক্ষা বিষয়ে তাঁর মতামত জানার সুযোগ পাওয়া যাবে। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ পাঠ করতে উঠলে জনতা 'বন্দে মাতরম্', 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়' প্রভৃতি ধ্বনি দেয়। এই ধ্বনি শুনেই জনতার মনোভাব বোঝা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে শক্ত ছিল না, কিন্তু তিনি নির্বিকারভাবে 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধটি পাঠ করে যান। অবশ্য তার আগে শ্রোতাদের অনুরোধ করেন, তারা যেন পাঠের মাঝখানে করতালি না দেন; কারণ তিনি জানেন শ্রোতারা সবরকম বিদেশী জিনিস পরিত্যাগ করেছেন, আর করতালি দেওয়াটা স্বদেশী প্রথা নয়। পরিশেষে রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ধন্যজ্ঞাপক প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন ও বিপিনচন্দ্র পাল তা সমর্থন করলে সভাভঙ্গ হয়।[১৬]

রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধটি নিছক কোনো সহজ অনুভূতির প্রকাশ নয়, জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকই এই প্রবন্ধ রচনার প্রধান উৎস। এই প্রবন্ধের নেপথ্যে আছে কবি-জীবনে সংঘটিত একটি সমকালীন ঘটনা। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় :

> ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষ আলোড়িত। রবীন্দ্রনাথ বিদেশ অর্থাৎ ইউরোপ-আমেরিকা ভ্রমণ শেষ করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া কবি-মানসে কিরূপ ছায়াপাত করিয়াছে তাহা জানিবার উদ্দেশ্যে সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহারই প্রতিবেদন স্বরূপে পরবর্তী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধটি প্রণীত হয়। প্রবন্ধটির বক্তব্যে জনমানসে আলোড়ন সৃষ্টি করে।[১৭]

CamScanner

এ বিষয়ে আরও উল্লেখ করা যায় :

> অসহযোগ ও বয়কট-সমর্থক পত্রিকাগুলি রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। উল্লেখযোগ্য প্রতিবাদটি এল হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখনী থেকে, তিনি 'শিক্ষার বিরোধ' প্রবন্ধটি লিখে 'গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন'-এ পাঠ করেন ও সেটি রবীন্দ্র-বিরোধী অসহযোগী নেতা চিত্তরঞ্জন দাসের পত্রিকার অগ্র-সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।[১৮]

শরৎচন্দ্রের লেখা এ-প্রবন্ধটি ছিল অত্যন্ত দুর্বল মানের। সে-কারণে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে এক সময় লজ্জিতও হন। এবং তাঁকে পত্র লিখে আত্মগ্লানি থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করেন। ঘটনাবহুল সময়ের সেই চিঠিটির কিছু অংশ নিম্নে উপস্থাপিত হলো :

> ছেলেদের মুখে মুখে শুনিতে পাইয়াছিলাম যে আপনি আমার প্রতি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। উত্তেজনার সময় রাগের মুখে হয়ত আপনার সম্বন্ধে মিথ্যা কিছু বলিয়া থাকিব–ইংলণ্ডের ব্যবহারে আপনি ক্ষুব্ধ হইয়াছেন এবং সমস্তই ওই পাঞ্জাব চিঠিখানার জন্য, ওটা না লিখিলে এ সকল কিছুই হইতে পারে না–এই কথাগুলা আমি যে ঠি কি ভাবে তখন বলিয়াছিলাম আমার মনে নাই, বানাইয়া মিথ্যা কথা আমি সচরাচর বলি না, কিন্তু বলা একেবারেই যে অসম্ভব তাহাও নয়। অন্তত, এ সব নিশ্চয়ই বলিয়াছি যে এবার বিলাত হইতে ফিরিয়া আপনি অনেক বদলাইয়া গিয়াছেন এবং বাঙলা দেশের লোকের প্রতি আপনার পূর্বের সে স্নেহ মমতা আর নাই। চরকা, নন-কো-অপারেশন প্রভৃতির উপর আপনার কোন আস্থা বা বিশ্বাস নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি। আপনার নিকট হইতে একদিন আমি রাগ করিয়াই চলিয়া আসিয়াছিলাম। তাহার পরেই হয়ত কতকগুলা মিথ্যা কথা প্রচার করিয়া থাকিব। হয়ত আমার মনের মধ্যে এ ভাব ছিল যে লোকে ভুল বুঝে ত বুঝুক। আপনার কাছে আমি অত্যন্ত অপরাধ করিয়াছি, কিন্তু এই প্রথম বলিয়া আমাকে মার্জনা করিবেন।... আপনার অনেক শিষ্যের মধ্যে আমিও একজন, তাহাদের মত এত কাল আমিও কখনো আপনার নিন্দা করিতে যাই নাই, কিন্তু এবার কেন যে আমার এরূপ দুর্বুদ্ধি হইল জানি না।[১৯]

অসহযোগ, বয়কট-সমর্থক তথা সর্বদেশব্যাপী রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধ পাঠে যে বিতর্কের শুরু হয়েছিল, তাতে প্রাবন্ধিক বিচলিত হন নি। বরং তাদের একটা সমুচিত জবাব দেয়ার জন্য সে সময় লিখেছিলেন 'সত্যের আহ্বান' নামক প্রবন্ধ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় :

> 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে সরাসরি কোনো বক্তব্য প্রকাশ করেননি। কিন্তু উক্ত প্রবন্ধপাঠের পরে সংবাদপত্রে ও মৌখিক আলোচনায় তাঁর সম্পর্কে এমন মন্তব্য করা শুরু হল যে, রবীন্দ্রনাথ মনে করলেন এই বিষয়ে তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট করে জানানোই ভালো। এই উদ্দেশ্যে তিনি 'সত্যের আহ্বান' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখে ১৩ ভাদ্র য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট হলে একটি সভায় পাঠ করলেন।[২০]

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রতিটি প্রবন্ধই চিন্তার প্রসার, গভীরতা ও প্রত্যয়ঘনতায় সমুজ্জ্বল হয়েছে। তন্মধ্যে ব্যতিক্রম ও বহুল আলোচিত-সমালোচিত প্রবন্ধ ছিল 'শিক্ষার মিলন'। রবীন্দ্রনাথ এ-প্রবন্ধে গান্ধীর সমালোচনা থেকে শুরু করে অসহযোগ আন্দোলন প্রসঙ্গে ভিন্নমত পোষণ, ইউরোপ-জার্মানির শিক্ষাব্যবস্থা, এবং তাঁর আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ কেমন হবে, সে বিষয়ে একটি চমৎকার দর্শন ফুটিয়ে তুলেছিলেন প্রবন্ধে। তিনি লক্ষ করেছিলেন, অসহযোগ আন্দোলনে গান্ধীজির দেশবাসী বিনা বিচারে মেনে চলার পথ হিসেবে গ্রহণ করেছে। রবীন্দ্রনাথ এর বিরুদ্ধে মত প্রদান করেছিলেন :

CamScanner

> পশ্চিমদেশে পোলিটিক্যাল স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ বিকাশ হতে আরম্ভ হয়েছে কখন থেকে? অর্থাৎ কখন থেকে দেশের লোক এই কথা বুঝেছে যে, রাষ্ট্রনিয়ম ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের খেয়ালের জিনিস নয়, সেই নিয়মের সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের সম্মতির সম্বন্ধ আছে? যখন থেকে বিজ্ঞানের আলোচনায় তাদের মনকে ভয়মুক্ত করেছে। যখন থেকে তারা জেনেছে, সেই নিয়মই সত্য যে নিয়ম ব্যক্তিবিশেষের কল্পনার দ্বারা বিকৃত হয় না, খেয়ালের দ্বারা বিচলিত হয় না।[২১]

ভারতমাতার কৃতি সন্তান মহাত্মা গান্ধী পাশ্চাত্য সভ্যতা ও যন্ত্রসভ্যতার বিরোধী ছিলেন, রবীন্দ্রনাথও তা খুব বেশি পছন্দ করতেন না। তিনি লিখেছেন :

> কেউ না মনে করেন, আমি কেবলমাত্র পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বের সম্বন্ধ নিয়েই এই কথাটা বলছি। যান্ত্রিকতাকে অন্তরে বাহিরে বড়ো করে তুলে পশ্চিম-সমাজে মানবসম্বন্ধের বিশ্লিষ্টতা ঘটেছে। কেননা, স্ক্রু দিয়ে আটা, আঠা দিয়ে জোড়ার বন্ধনকেই ভাবনায় এবং চেষ্টায় প্রধান ক'রে তুললে, অন্তরতম যে আত্মিক বন্ধনে মানুষ স্বতঃপ্রসারিত আকর্ষণে পরস্পর গভীরভাবে মিলে যায় সেই সৃষ্টি শক্তিসম্পন্ন বন্ধন শিথিল হতে থাকে।... সেইজন্যে এই যান্ত্রিকতায় যাদের মন পেকে যায় তারা যতই ফললাভ করে, ফললাভের দিকে তাদের লোভের ততই অন্ত থাকে না। লোভ যতই বাড়তে থাকে মানুষকে মানুষ খাটো করতে ততই আর দ্বিধা করে না।[২২]

রবীন্দ্রনাথ প্রায় দেড়বছর য়ুরোপ ও আমেরিকায় অবস্থান করেছিলেন। বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ তাঁর জীবন। তিনি জার্মানি দেশ সম্পর্কে সমালোচনা করে লিখেছেন :

> জার্মানি একদা শিক্ষাব্যবস্থাকে তার রাষ্ট্রনৈতিক ভেদবুদ্ধির ক্রীতদাসী করেছিল বলে পশ্চিমের অন্যান্য নেশন তার নিন্দা করেছে। পশ্চিমের কোন্ বড়ো নেশন এ কাজ করে নি? আসল কথা, জর্মনি সকল বিভাগেই বৈজ্ঞানিক রীতিকে অন্যান্য সকল জাতির চেয়ে বেশি আয়ত্ত করেছে, সেইজন্যে পাকা নিয়মের জোরে শিক্ষাবিধিকে নিয়ে স্বাজাত্যের ডিমে তা দেবার ইনক্যুবেটর যন্ত্র সে বানিয়েছিল; তার থেকে যে বাচ্ছা জন্মেছিল দেখা গেছে অন্যদেশী বাচ্ছার চেয়ে তার দম অনেক বেশি।[২৩]

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিশেষত উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ চিন্তা লালন করেছেন 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ হবে এ রকম :

> এই জন্যেই আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতনকে পূর্বপশ্চিমের মিলননিকেতন ক'রে তুলতে হবে, এই আমার অন্তরের কামনা। বিষয়লাভের ক্ষেত্রে মানুষের বিরোধ মেটে নি, সহজে মিটতেও চায় না। সত্যলাভের ক্ষেত্রে মিলনে বাধা নেই। যে গৃহস্থ কেবলমাত্র আপন পরিবারকে নিয়েই থাকে, আতিথ্য করতে যার কৃপণতা, সে দীনাত্মা। শুধু গৃহস্থের কেন, প্রত্যেক দেশেরই কেবল নিজের ভোজনশালা নিয়ে চলবে না, তার অতিথিশালা চাই যেখানে বিশ্বকে অভ্যর্থনা করে সে ধন্য হবে। শিক্ষাক্ষেত্রেই তার প্রধান অতিথিশালা। দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষে বর্তমান কালে শিক্ষার যত-কিছু সরকারি ব্যবস্থা আছে তার পনেরো-আনা অংশই পরের কাছে বিদ্যাভিক্ষার ব্যবস্থা।[২৪]

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানীতি ও আদর্শ বর্তমান দেশের প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শ্যামল-স্নিগ্ধ উদার বিস্তৃত প্রকৃতির মধ্যে গভীরভাবে আত্মনিমগ্ন হয়ে যে শিক্ষা-সাধনা, তাই সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষারীতি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন। এ-প্রসঙ্গে বিশিষ্ট গবেষক অম্লান দত্ত বলেছেন – 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের মূলেও এই রকম সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা আছে। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে বিশ্ব মানবের সম্পর্ক–এই রকম কতকগুলোসম্পর্কেও ধারণা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের মূলে আছে।'[২৫]

CamScanner

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন বিশ্বপ্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্য ও মাধুর্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থেকে কেবল পাঠ্যপুস্তকাবদ্ধ বিষয়াত্মক শিক্ষার দ্বারাই মানব-মন যথোচিতভাবে প্রসারিত ও বিকশিত হতে পারে না। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি ও বাংলা ভাষার দুইটি ধারা প্রণয়নের সুপরিকল্পিত নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর মতে, সাদা কালো দুই স্রোত গঙ্গা যমুনা ধারায় বিভক্ত থাকলেও তারা একত্রেই প্রবাহিত হয়। ইংরেজিকে দ্বিতীয় ভাষা রূপে সম্যকভাবে শিক্ষা করতে হবে; কিন্তু শিক্ষার মাধ্যম হবে অবশ্যই মাতৃভাষা। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, বিদেশি ভাষা বিশেষত, ইংরেজির মাধ্যমে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তার পিছনে ব্যবসা ও চাকরি চলছে আনুসঙ্গিক হয়ে। সেইহেতু শিক্ষার মূল অভিপ্রায় বা লক্ষ্য হতে বিচ্যুত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ও অর্থোপার্জনের সামর্থ্যের প্রতি শিক্ষার্থীর মন-প্রাণ কেন্দ্রীভূত হয়। একজন গবেষক উল্লেখ করেছেন।

> শিক্ষার সঙ্গে বিত্তের ঐক্যরক্ষা সর্বত্রই অপরিহার্য, কিন্তু এও সত্য যে, শিক্ষার প্রসার একদিকে যেমন বিত্তসংগ্রহে সাহায্য করে, তেমনি আর একদিকে শিক্ষিতের অভিজ্ঞতা বিভিন্ন উপায়ে বিত্ত সংরক্ষণের সাহায্যও করে থাকে। নতুন বিত্তও শিক্ষিত দল আনয়ন করে থাকে।[২৬]

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার মাধ্যমের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। স্বদেশের শিক্ষাবিস্তারের প্রধান বাধা ইংরেজি ভাষা। কোনো বিদেশি ভাষার সাহায্যে দেশের প্রতিটি মানুষের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার যে অসম্ভব, এই সহজ সত্যকে রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু এই উপলব্ধির অর্থ এই নয় যে, তিনি ইংরেজি-ভাষা শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। একজন উল্লেখ করেছেন :

> রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন তথা মানবভাবনার মূলে যে চলমান ও সমগ্রতাবাদী বিশ্বতত্ত্ব বিদ্যমান, তা কেবল রেনেসাঁস-প্রভাবিত নয়। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যেও সভ্যতা ও সংস্কৃতির আবহমান উৎসসমূহের গভীর অঙ্গীকার তাঁর মধ্যে এক স্বতন্ত্র বোধ সঞ্চার করেছিলো। এই বোধ বস্তুগত এবং ভাবগত উপকরণপুঞ্জের সুষম ঐক্যে সুগঠিত।[২৭]

শিক্ষার নানামুখী সমস্যা ও যথার্থ শিক্ষার সমুচিত পন্থা বিচার-বিবেচনা করে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষানীতি সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তা তাঁর বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় বিশেষ মূল্যবান। বর্তমানে দেশের প্রচলিত শিক্ষার সঙ্গে দেশিয় জনসাধারণের মধ্যে যে অনন্ত ব্যবধান থেকে যায়, তার মূল কারণ তিনি অতি বিচক্ষণভাবে অনুসন্ধান করেছেন। দেশের প্রচলিত শিক্ষা-প্রদ্ধতির অন্যতম বিশেষ ত্রুটি এই যে, সর্ববিধ শিক্ষা-কর্মই মাতৃভাষার পরিবর্তে বিদেশি অর্থাৎ ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। অথচ সত্যিকার শিক্ষার ভিত্তি মাতৃভাষা ও সাহিত্যের ওপরই স্থাপিত হয়ে থাকে। শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ তুল্য–এই সহজ সত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথ সর্বাগ্রে দৃষ্টিপাত করেছেন।

শেষকথা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর শিক্ষাব্রতী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচিত প্রবন্ধসমূহ রচনা করেছিলেন। শিক্ষাবিদ হিসেবেও তাঁর যে স্বতন্ত্র পরিচয় আছে, অর্থাৎ শিক্ষানীতি সম্পর্কে তাঁর মৌলিক দর্শন-চিন্তার যে গভীর স্বাক্ষর সুচিহ্নিত এবং শিক্ষা-দর্শনেরই একটি ব্যবহারিক দিক তা এই জাতীয় প্রবন্ধসমূহ হতে লাভ করা যায়। এটি অস্বীকার করবার উপায় নেই যে,রবীন্দ্রনাথ এক আদর্শ শিক্ষানীতি প্রচার করে, জাক রুশো, পেস্টালৎজি, ফ্রয়েবেল, মন্তেসরী, ডিউঈ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদগণের ন্যায় এক বিশিষ্ট গৌরবের অধিকারী হয়েছেন।

CamScanner

বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য রবীন্দ্রনাথের হাতে নতুন সৃষ্টিকর্ম হয়ে দেখা দিয়েছে। শিক্ষাই শুধু নয়, প্রবন্ধে সমাজ, দেশ, অর্থনীতি, মানবিকতা এমন কোনো দিক নেই যা কিছু নিয়ে রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করেন নি, ভাবেন নি। সৈয়দ আলী আহসান এ-বিষয়ে বলেন :

> আমরা জানি প্রত্যেক দেশে মহৎ কবির আবির্ভাব যখন ঘটে, তখন তিনি দেশের ভাষাকে রূপ দেন। তাঁর সময় পর্যন্ত সে ভাষায় যে রূপ, যে অভিব্যক্তি থাকে, সেই অভিব্যক্তিকে আরও বিচিত্র করেন। ইংল্যান্ডে শেক্সপীয়ার করেছিলেন, ইটালিতে দান্তে করেছিলেন, জার্মানিতে গ্যয়টে করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে সেই কর্তব্য সাধন করেছিলেন।[২৮]

আর সে-কারণেই প্রবন্ধ সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের লেখনী যাদুতে হয়ে উঠেছে অভিনব এক শিল্পসৃষ্টি। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং তার রূপায়ণের জন্য রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার কথা সর্বজনবিদিত। তিনি শান্তিনিকেতনে শিক্ষার সার্থক প্রয়োগের জন্য আশ্রমবিদ্যালয়, প্রকৃতির সঙ্গে বিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠ সংযোগ, পাঠ্য বিষয়ের সহজ সরল রূপ প্রভৃতি বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। 'তবে শান্তিনিকেতনের বিশেষ শিক্ষা ও উপযুক্ত সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও পরিমণ্ডলটি সৃষ্টি করে তুলতে রবীন্দ্রনাথকে কম বেগ পেতে হয় নি। নানা দিক থেকেই তার বিরুদ্ধ ও প্রতিকূল শক্তি কাজ করেছে।'[২৯] 'শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র শিক্ষাধারার সবচেয়ে বড় কথা হলো ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে একাত্মতা।'[৩০] তেমনিভাবে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল মহৎ শিক্ষাগ্রহণ ও ব্যবস্থাপনার চিন্তায়। 'যে সমস্ত শিক্ষার যেটা মূল সেই মূল্যবোধকে জাগিয়ে তোলার প্রেরণা দেওয়াই বিশ্বভারতীর আদর্শ ছিল।'[৩১] তিনি দৃঢ়চিত্তে বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষাই জাতীয় প্রগতির প্রধান সোপান। তাই তিনি শিক্ষাকে মূলমন্ত্র করে দেশের জাতীয় জীবনকে এক নতুন রূপদান করতে চেয়েছিলেন। শিক্ষার অভাবই সমষ্টি ও ব্যষ্টির জীবনে অচল অবস্থা সৃষ্টি করে, সেই অচলাবস্থা অতিক্রম করতে হলে দেশব্যাপী শিক্ষার বিস্তার চাই। 'বাবা সর্বদাই চেষ্টা করতেন ছাত্ররা শিশু অবস্থা থেকেই যাতে আত্মনির্ভর হতে শেখে।'[৩২] তাঁর ত্রয়ী প্রবন্ধে প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত হয়েছে। প্রবন্ধগুলোতে তিনি শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যার কথা যেমন বিশ্লেষণ করেছেন, তেমনি তার সমাধানের পথ নির্দেশ করেছেন। সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের ত্রয়ী প্রবন্ধে দেশের বিবিধ শিক্ষা-সমস্যা, শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষাধারার গতি-প্রকৃতি ও শিক্ষা-পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁর গভীর বিচার-বিশ্লেষণ সুচিন্তিত মীমাংসার পরিচয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

তথ্য-নির্দেশ

১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনকথা, (কলকাতা : ষষ্ঠ মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪০৭), পৃ. ৪০

২. প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, তৃতীয় খণ্ড, (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ., প্রথম-সং., বৈশাখ ১৩৯৪), পৃ. ২৩৭

৩. প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, তৃতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৯

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, (কলকাতা: বিশ্বভারতী, বৈশাখ ১৪০৯), পৃ. ৫৬৮

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৯

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৬

৭. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনকথা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭

৮. প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, সপ্তম খণ্ড, (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ., প্রথম-সং., বৈশাখ ১৪০৪), পৃ. ১৩০

CamScanner

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, নবম খণ্ড, (কলকাতা: বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪০৯), পৃ. ৬২৪
১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, নবম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২০
১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২৩
১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২৪
১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২৫
১৪. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনকথা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬-১১৭
১৫. প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, অষ্টম খণ্ড, (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ., প্রথম-সং., মাঘ ১৪০৭), পৃ. ১৩১-১৩৪
১৬. প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, অষ্টম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৩-১৩৪
১৭. অধীর দে, আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারা, দ্বিতীয় খণ্ড, (কলকাতা : উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, পরিমার্জিত দ্বিতীয়-সং., মে ২০০৭), পৃ. ৪৬
১৮. প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, অষ্টম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৫
১৯. প্রশান্তকুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬-১৩৭
২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৫
২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষোড়শ খণ্ড, (কলকাতা: বিশ্বভারতী, মাঘ ১৪০৭), পৃ. ৩০৬
২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষোড়শ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১০
২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৫
২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৬
২৫. অম্লান দত্ত, 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন'। আবু হেনা মোস্তফা কামাল (সম্পা.), রবীন্দ্রনাথ (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২), পৃ. ২০
২৬. মুহাম্মাদ কুদরত এ-খুদা, 'শিক্ষাসমস্যা ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তা'। আনিসুজ্জামান (সম্পা.), রবীন্দ্রনাথ, (ঢাকা : অবসর, প্রথম অবসর প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০১), পৃ. ৪২
২৭. রফিকউল্লাহ খান, রবীন্দ্র-বিষয়ক, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯৩), পৃ. ২
২৮. সৈয়দ আলী আহসান, 'রবীন্দ্রনাথ'। মোবারক হোসেন (সম্পা.), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১১), পৃ. ৫৭
২৯. নেপাল মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ : শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি প্রসঙ্গে, (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০০), পৃ. ১৭৬
৩০. আশরাফ সিদ্দিকী, রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন, (ঢাকা : মুক্তধারা, তৃতীয় প্রকাশ, মে ১৯৮৬), পৃ. ৬৮
৩১. মৈত্রেয়ী দেবী, রবীন্দ্রনাথ গৃহে ও বিশ্বে, (কলকাতা : প্রাইমা পাবলিকেশন্স, তৃতীয়-সং., বৈশাখ ১৩৯৪), পৃ. ১৬৭
৩২. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পিতৃস্মৃতি, (কলকাতা : জিজ্ঞাসা পাবলিকেশন্স্, পুনর্মুদ্রণ , বৈশাখ ১৩৯৫), পৃ. ৫৯

CamScanner

লেখনী ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক জার্নাল § প্রথম সংখ্যা মাঘ ১৪২৩ জানুয়ারি ২০১৭

খায়রুন নিসা*

স্ত্রীশিক্ষা : রবীন্দ্র-দৃষ্টিভঙ্গি

সারসংক্ষেপ : *নারী-স্বাধীনতা ও নারী-শিক্ষা সংক্রান্ত ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশিষ্ট, অগ্রসরমান ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধে। সেখানে তিনি সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিতে নারী-স্বাধীনতা ও নারী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রসাহিত্যে নারীর প্রতি দ্বৈত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় থাকলেও 'স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধে নারীকে সভ্যতা বিকাশের সোপান হিসেবে তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। নারী-শিক্ষা ও নারী-স্বাধীনতা প্রসঙ্গে 'স্ত্রী শিক্ষা : রবীন্দ্র-দৃষ্টিভঙ্গি' শীর্ষক প্রবন্ধটি বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ করার একটি প্রয়াসমাত্র।*

উনিশ শতকের বাংলা নবজাগরণের কালে নারীর মহিমা শিক্ষিত বাঙালিকে মোহিত করলেও নারী-স্বাধীনতা ও নারী-শিক্ষা সম্পর্কে তাদের মতানৈক্য ছিল। রবীন্দ্রনাথের মতো নবজাগরণের অনিবর্চনীয় স্তম্ভ বাঙালির বৈষয়িক ও আত্মিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান থাকলেও তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনের বেশ কাল ধরে এই দ্বিধা থেকে মুক্ত ছিলেন না। রবীন্দ্র চিন্তায় তাই বরাবার ফিরে এসেছে সে-দ্বৈত ও দ্বৈধ দৃষ্টিভঙ্গির কথা। তাহলেও, রবীন্দ্রনাথের নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আধুনিক, সাহিত্যের নানা শাখায় সে-আধুনিকতার স্পর্শ আমরা পেয়ে থাকি। নারী এবং প্রকৃতি এই দুই-এ সুষমামণ্ডিত রবীন্দ্রসাহিত্য। ভাবুক ও কবি রবীন্দ্রনাথ নারীকে দেখেছেন রোমান্টিক দৃষ্টিতে। যার ফলে শত বাস্তব প্রেক্ষাপটেও নারীকে তিনি কল্পনা করেছেন তাঁর অন্তরের মানসসুন্দরীর মতো করে।

*স্নাতক সম্মান (৩য় বর্ষ, ২য় সেমিস্টার) বাংলা বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট, বাংলাদেশ

CamScanner

রবীন্দ্র নারীচেতনা ভারতীয় ঐতিহ্যপুষ্ট এবং সাহিত্যিক ভাবনামণ্ডিত। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখের সমাজসংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড বাঙালি নারীজীবনে যে-অভূতপূর্ব আলোড়ন এনেছিল রবীন্দ্র-নারীচেতনা তারই অভিঘাতের ফল। রবীন্দ্র সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা বাঙালি নবজাগরণের যথার্থ প্রতিফলন বলে পরিগণিত। নারীস্বাধীনতা এবং নারীভাবনায় রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যথেষ্ট অগ্রগতিসম্পন্ন। রবীন্দ্রসাহিত্যই এর সবচেয়ে বড়ো নির্দশন। এরপরও ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ এবং লেখক রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এ-বিষয়ে ছিল দ্বন্দ্ব এবং দ্বিধা। গত দুই শতাব্দীর অন্যতম মহান পুরুষ অনেকদিন পর্যন্ত এই দ্বিধা থেকে বের হয়ে আসতে পারেননি। এমনকি তাঁর উপন্যাস-গল্প নাটক ও কবিতায় নারীর প্রতি রবীন্দ্র দৃষ্টিভঙ্গির যে-রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল মনোভাবের স্ববিরোধ দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলোতে বিশেষ করে 'স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধে তাঁর মতামতকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। সেখানে একজন সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে নারীর স্বাধীনতা ও নারীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে বিবেচনা করেছেন। অন্তত সেখানে নারীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের দ্বৈত ও দ্বৈধ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়-ই না, বরং তিনি নারীকে মানুষ হয়ে ওঠার জন্য যে-শিক্ষা প্রয়োজন রয়েছে তা ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে। নারী শিক্ষিত হয়েও নিজের সংসার সন্তানসন্তাদির প্রতি দায়িত্ব পালনে ব্রতী হতে পারে। তবুও কিছু প্রশ্ন থেকে যায় যখন ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ এবং সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নারীশিক্ষা এবং নারীস্বাধীনতার বিষয়ে দ্বৈত আচরণ লক্ষ করা যায়। কিন্তু তিনি শেষপর্যন্ত নারীশিক্ষা ও নারীস্বাধীনতার প্রতি ঘুরে দাঁড়ান তাঁর পরিণত বয়সে। রবীন্দ্র শিক্ষাভাবনায় নারীশিক্ষার বিষয়টি আসে অবধারিতভাবে। এবং ইতিবাচকভাবে অবশ্যই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্র নারীভাবনার মতো রবীন্দ্র নারীশিক্ষা-ভাবনা রবীন্দ্র কবিমনন ও জীবনদর্শন-প্রসূত।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা, অণুপ্রেক্ষিত

সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাইরেও আরও একটি সত্তা রয়েছে, যা তাকে পৃথিবীর অন্যান্য বিখ্যাত বিশ্বসাহিত্যিক থেকে স্বতন্ত্র্য মর্যাদায় আসীন করেছে। তিনি সমাজসংস্কারক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শুধু সমাজসংস্কার নয়, শিক্ষাভাবনায়ও রবীন্দ্রনাথকে গুরুত্বসহকারে আত্মনিয়োগ করতে হয়েছিল। ঔপানিবেশিক শাসকগণ কর্তৃক আরোপিত উদ্দেশ্যমূলক ও গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার ওপর ছেলেবেলাতেই আস্থাহীন হয়ে পড়েছিলেন তিনি। ইংরেজদের মূল লক্ষ্য ছিল বেতনভুক্ত পড়াশোনা জানা কিছু উন্নতশ্রেণির 'চাকর' সৃষ্টি করা। মাত্র ষোলো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদেশের শিক্ষাব্যবস্থা প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এতেই তাঁর শিক্ষাভাবনার মৌলিকতা ধরা পড়ে। সেখানে তিনি লিখেছেন :

> বঙ্গদেশে এখন এমনি সৃষ্টিছাড়া শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত হইয়াছে যে তাহাতে শিক্ষিতেরা বিজ্ঞান দর্শনের কতকগুলি বুলি এবং ইতিহাসের সাল-ঘটনা ও রাজাদিগের নামাবলী মুখস্ত করিতে পারিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের রুচিরও উন্নতি করিতে পারেন নাই বা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতেও শিখেন নাই। (ঠাকুর, ১৩৮৯ : ৬১)

এতে অনুধাবন করা যায় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কতোটা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। শুধু তাই নয়, বাল্যকালে সঙ্গী-সাথীদের স্কুলে যেতে দেখে অনুযোগ করতেন রবীন্দ্রনাথ। যতটা আগ্রহ নিয়ে তিনি স্কুলে যান তার চেয়ে শতগুণ তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে স্কুল ছাড়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেন। যদি তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা বালক রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্টই করতে পারত তাহলে শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতনের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হয়ত হতো না। ব্যক্তি তার দায়বোধ থেকে অনেক কিছু করতে চায়।

CamScanner

রবীন্দ্রনাথও এক প্রকার দায়বোধ থেকেই শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন। রবীন্দ্র শিক্ষাভাবনার যে-বিষয়টি বস্তুনিষ্ঠভাবে ফুটে উঠেছিল তা হচ্ছে শিক্ষা শুধু ডিগ্রি অর্জনের জন্য নয় একে আত্মস্থ করতে হবে। তাঁর মেধা, মনন এবং কঠোর পরিশ্রমের ফলে শান্তিনিকেতনে এক অভিনব শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করলেন। বিলাসিতাহীন, অনাড়ম্বর এবং দারিদ্রকে অতিক্রম করে জ্ঞানের সাধনায়ই ছিল এর মূল লক্ষ্য।

শান্তিনিকেতনের জন্য রবীন্দ্রনাথ এমন শিক্ষকের খোঁজ করছিলেন যাঁরা আধুনিক শিক্ষার শিক্ষিত হয়েও ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারক এবং বাহক। শান্তিনিকেতনে আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে ঐতিহ্যের মেলবন্ধন করে পাঠক্রম চলত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিবারের সন্তানদের ওপরই সবচেয়ে বেশি এক্সপেরিমেন্ট করেছেন এবং বলা বাহুল্য যে, তিনি সফলও হয়েছেন। গ্রন্থগত-বিদ্যার সঙ্গে কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও তিনি অনুভব করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ছেলে রথীন্দ্রনাথ মুচি ও ছুতোরের কাজ পর্যন্ত নিজে করেছেন। (মামুদ, ২০১১ : ১৫৮)। এ-প্রসঙ্গে 'অসন্তোষের কারণ' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> যদি আমাদের দেশের শিক্ষায় ছাত্রদিগকে চাকরি ছাড়া অন্যান্য জীবিকার সংস্থানে পটু করিয়া তুলিত তাহা হইলে এই সম্বন্ধে নালিশের কথা থাকিত না। কিন্তু পটু না করিয়া সর্বপ্রকারের অপটুই করিতেছে এ কথা আমরা নিজের প্রতি তাকাইলে বুঝিতে পারি। (ঠাকুর, ১৪১৭ : ২৯৮)

তাই 'প্রয়োগিক' ও 'সত্যসন্ধ' শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যেমন আক্ষেপ করেছেন, কখনো-বা এমনতর শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনে নিজেও উদ্যোগগ্রহণ করেছেন; একইভাবে 'মানুষ হইয়া উঠাই শিক্ষা' রবীন্দ্রনাথের এই আপ্তবাক্যের ভেতর 'প্রাণপণ চেষ্টায় মানুষ' এমন দার্শনিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যখন ভাবিত তখন তার ভাবনায় নারীশিক্ষাও উপেক্ষিত থাকে নি। যদিও নারীশিক্ষা ও নারী স্বাধীনতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কবি ও দার্শনিকসুলভ।

নারীস্বাধীনতা, ঠাকুর-পরিবার ও রবীন্দ্রনাথ

উনিশ শতকের রেনেসাঁসে ঠাকুর-পরিবার অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। বিশেষ করে নারীশিক্ষা ও নারীস্বাধীনতায় ঠাকুরবাড়ির ভূমিকা ছিল কিংবদন্তিতুল্য। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এ-ব্যাপারে খুব উদার ছিলেন। ঠাকুর বাড়ির ছেলেমেয়েরা গুরুপ্রদত্ত শিক্ষা থেকে শুরু করে সঙ্গীত চর্চা পর্যন্ত করতেন। তখনকার সময়ে ঠাকুর-বাড়ির নারীরা অন্যান্য নারীর চেয়ে যথেষ্ট অগ্রগামীও ছিলেন। তবুও এই গণ্ডি থেকে বের হওয়া তাদের পক্ষে সহজ ছিল না। এব্যাপারে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা পালন করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সমালোচকের মতে, 'মহর্ষি-পরিবার নারীজাতির উন্নতিকল্পে ক্রমশ যেসকল ব্যবস্থা স্বীকৃত হতে লাগল তার প্রবর্তনের মূলে তরুণ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান উদ্‌যোগী ছিলেন।' (সেন, ২০১২ : ২০৪) সত্যেন্দ্রনাথের অপর দুই ভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও হেমেন্দ্রনাথও ঠাকুরবাড়ির নারীশিক্ষা ও স্বাধীনতায় বেশ ভূমিকা রেখেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথই প্রথম ঠাকুরবাড়ির বধূকে পর্দার বাইরে নিয়ে আসার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, বিলেত থেকে সত্যেন্দ্রনাথ হেমেন্দ্রনাথের প্রতি পত্র লিখে জ্ঞানদানন্দিনীকে ইংরেজি শেখাবার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। সাহিত্য সংস্কৃতিচর্চায় ঠাকুর বাড়ির মেয়েরা সহজেই আত্মনিয়োগ করতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের বড়ো বোন স্বর্ণকুমারী দেবী সাহিত্যচর্চা করতেন। তিনি তাঁদের পারিবারিক ভারতী পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

CamScanner

তাঁর দুই মেয়ে সরলা এবং হিরন্ময়ী সাহিত্যসাধনায় ব্রতী ছিলেন। স্বর্ণকুমারীর মৃত্যুর পর ভারতীর সম্পাদনার কাজ দুই বোন মিলে করতেন। সরলা এবং হিরন্ময়ী মিলে মেয়েদের জন্য একটি পাঠশালাও খুলেছিলেন নিজের বাড়িতে। রবীন্দ্রনাথের বৌঠান কাদম্বরী দেবী কলকাতার রাস্তায় প্রথম ঘোড়ার গাড়ি করে বেড়িয়েছিলেন । তখনকার যুগে বলতে গেলে এটি একটি অস্বাভাবিক ঘটনা ছিল। জ্ঞানদানন্দিনী সিভিল সমাজে চলার জন্য নিজেকে যথার্থ উপযোগী করে তুলেছিলেন। একাকী তিনি বিলেতেও পাড়ি জমিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী পড়াশুনা শেষ করে ২৬ বছর বয়সে বিয়ে করেন এবং সরলা বিয়ে করেন ৩৩ বছর বয়সে। সরলা দেবী ইংরেজি সাহিত্যে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করে স্বর্ণপদক প্রাপ্তও হন। এ-প্রসঙ্গে চিত্রা দেব লিখেছেন :

> অসংখ্য বাধানিষেধের গণ্ডি পার হয়েই মেয়েদের, এমনকী ঠাকুর বাড়ি মেয়েদের আত্মপ্রকাশ করতে হয়েছিল। সহজে হয়নি। প্রথমদিকে এ বাড়ির মেয়ে এবং বউয়েদের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রে বিশেষ শক্তির পরিচয় রেখে গিয়েছেন, কিন্তু যাঁদের নাম বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়েনি, পড়বার কারণও নেই, তাঁদের ভূমিকাও নেহাত কম ছিল না। চলবার বাঁধা-পথ তাঁরা পাননি, পথ তাঁদের তৈরি করে নিতে হয়েছিল। (দেব, ২০১৪ : ২)

সুতরাং বলা যায় যে, উনিশ শতকের নারীআন্দোলনে সত্যেন্দ্রনাথের দান প্রধানত তাঁর পরিবারের মধ্য দিয়েই লাভ করেছে। অর্থাৎ, 'উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণের প্রধান একটি কেন্দ্র দেবেন্দ্র-ভবন, বঙ্গনারীর আত্মবিকাশের উদ্যোগ এই পরিবারের কন্যা ও বধূদের দ্বারা এককালে অনেকখানি পুষ্টি লাভ করেছে।'(সেন, ২০১২ : ২০৪) কিন্তু তা সত্ত্বেও খটকা লাগে একটি বিষয়ে যে, রবীন্দ্রনাথের কন্যাসন্তানেরা ঠাকুরবাড়ির সন্তান হয়েও তারা ইন্দিরা-সরলার মতো শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারেন নি। আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হলো রবীন্দ্রনাথ তাঁর তিনটি মেয়েকেই বাল্যবিবাহ দিয়েছেন। বাল্যবিবাহের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেনও বিস্তার। লিখেছেন কিন্তু নিজেই তা রক্ষা করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বাল্যবিবাহ করেছিলেন। কিন্তু উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে এটা মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু তিনি তাঁর মেয়েদের জন্য যথার্থ শিক্ষার পর্যন্তও ব্যবস্থা করতে পারেন নি। এমনকি তিনি যখন অর্থকষ্টে ছিলেন তখনও পুত্র রথীন্দ্রনাথকে ইংল্যান্ডে পাঠিয়েছিলেন কৃষিবিষয়ক উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণের জন্য। অন্যদিকে, মেয়েদের বাল্যবিবাহ দেওয়ার বিষয়টিকে নিয়ে অনেকেই তাঁকে ঠাট্টা পরিহাস করেছেন। কারণ শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ ব্রাহ্ম-সমাজের সদস্য 'স্ত্রী-স্বাধীনতার দল নামে পরিচিত ছিলেন। ১৮৭২-৭৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে তাঁরা বাল্যবিবাহের বিপক্ষে, স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষে সংগঠিত হয়েছিলেন।'(ঘোষ, ২০১৫: ৮)

নারী-স্বাধীনতা এবং শিক্ষার বিষয়টির প্রতি সম্মতি দিতে দ্বিধায় ছিলেন তিনি যা পরবর্তীতে তাঁর সামনে একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে দাঁড়ায়। তাহলে রবীন্দ্রনাথ রক্ষণশীল মানুষ ছিলেন? তিনিই তো যোগাযোগ, চার অধ্যায়, ঘরে বাইরে, চোখের বালি লিখেছেন। সৃষ্টি করেছেন মৃণাল, অনিলা, ইলা , বিমলা, বিনোদিনী, সোহিনীর মতো চরিত্র। সুতরাং এমন মন্তব্য আমরা তাঁর ওপর চাপিয়ে দিতে পারি না। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে কেন এমন রক্ষণশীলতার পরিচয় দিবেন রবীন্দ্রনাথ এ-প্রশ্ন থেকেই যায়।

CamScanner

রবীন্দ্রসাহিত্য নারী সুষমায় মণ্ডিত। রবীন্দ্রনাথের নারীরা মমতাময়ী, দরদী, স্নেহপ্রবণ এবং বাৎসল্যপ্রীতিসম্পন্ন। নারীর সার্থকতা মাতৃত্বে। নারীর অন্য স্বাধীনতা থাকবে ঠিকই কিন্তু নারীকে নারী হয়েই থাকতে হবে। এই নারীসুলভ বৈশিষ্ট্যই নারীর সার্থকতা। এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট অভিমত হচ্ছে :

> আসল কথা এই, স্ত্রী হওয়া, মা হওয়া, মেয়েদের স্বভাব; দাসী হওয়া নয়। ভালবাসার অংশ মেয়েদের স্বভাবে বেশি আছে-এ নহিলে সন্তান মানুষ হইত না, সংসার টিকিত না। স্নেহ আছে বলিয়াই মা সন্তাদের সেবা করে, তার মধ্যে দায় নাই, প্রেম আছে বলিয়াই স্ত্রী স্বামীর সেবা করে, তার মধ্যে দায় নাই। (ঠাকুর, ১৪০৭ : ২৮৭)

রবীন্দ্র রোমন্টিকতার মূলে রয়েছে নারী এবং প্রকৃতি। রবীন্দ্রনাথের নারী সম্পর্কে যে মতামত ছিল তা সমাজ, রাষ্ট্র এবং যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্র দৃষ্টিভঙ্গিরও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতায় সম্মতি দেন রবীন্দ্রনাথ। দীর্ঘ জীবনের দ্বিধা ভেঙে নতুনভাবে নারীকে উপলব্ধি করে তিনি লিখছেন 'পয়লা নম্বর', 'স্ত্রীর পত্র', 'ল্যাবরেটরি'র মতো অসাধারণ ছোটগল্প, যেখানে নারীকে তিনি দিয়েছেন চিন্তা করার পরিসর, ব্যক্তিমানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস। এসব 'বাস্তব সংসারজীবনে নারীর অসহায় বন্দিত্ব ও মুক্তির বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে।' (মোমেন, ২০১২ : ১৪২) চোখের বালি (১৯০৩), যোগাযোগ (১৯২৯), চার অধ্যায় (১৯৩৪) ঘরে বাইরে (১৯১৫) উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ নারীমুক্তির পথনির্দেশ করেছেন। এ-প্রসঙ্গে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের অভিমত প্রণিধানযোগ্য :

> নারীজীবনের সার্থকতা সমন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা শেষতম পরিচয়স্থল 'স্ত্রীর পত্র' গল্প। তিনি একসময় বিশ্বাস করতেন, নারীজীবনের চরম সার্থকতা মাতৃত্বে ('শকুন্তলা', 'কুমার সম্ভব' ও 'শকুন্তলা,/ প্রাচীন সাহিত্য)। বর্তমান শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত এ বিশ্বাস বজায় ছিল। (মুখোপাধ্যায়, ২০১১ : ৭৪)

রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প এবং উপন্যাসের এই নায়িকাদের অঙ্কন করেছেন শিক্ষিত নারীচরিত্র হিসেবে। মৃণাল, হৈমন্তী, অনিলা, বিমলা, ইলা, কুমুদিনী প্রভৃতি এর উদাহরণ। মৃণাল চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের অনন্য সৃষ্টি। তিনি মৃণালকে কবিত্ব শক্তি দিয়েছেন। মৃণালের মাধ্যমেই রবীন্দ্রনাথ এতদিনের না-বলা কথার স্ফুরণ ঘটিয়েছেন। সেই সময়ের প্রেক্ষিতে মৃণালের মতো চরিত্রনির্মাণ করা অনেক লেখকের জন্যে দুঃসাধ্যই ছিল। তৎকালীন বিদ্বান-সমাজের মধ্যে অনেকেই মৃণালের উপস্থিতিতে মেনে নিতে পারেন নি। এ-প্রসঙ্গে সমালোচক লিখেছেন :

> সুবজপত্রে 'স্ত্রীর পত্র' গল্প প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য ও সমাজে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। নারায়ণ মাসিক পত্রে ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিপিনচন্দ্র পাল তীব্র প্রতিবাদ করেন। নারায়ণ-এর প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 'স্ত্রীর পত্রের', প্যারডি 'মৃণালের কথা'। (মুখোপাধ্যায়, ২০১১ : ৭৫)

রবীন্দ্রনাথ যে নারীস্বাধীনতার সমর্থক এর থেকে বড়ো প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে মৃণালের কণ্ঠস্বর শুনলে আমরা চমকে যাই :

> আমার একটা জিনিস তোমাদের ঘরকন্যার বাইরে ছিল, সেটা কেউ তোমরা জান নি। আমি লুকিয়ে কবিতা লিখতুম। সে ছাইপাঁশ যাই হোক না, সেইখানে, তোমাদের অন্দরমহলের পাঁচিল ওঠে নি। সেইখানে আমার মুক্তি; সেইখানে আমি আমি। আমার মধ্যে যা কিছু তোমাদের মেজো বউকে ছাড়িয়ে রয়েছে সে তোমরা পছন্দ করনি, চিনতেও পারনি, আমি যে কবি সে এ পনেরো বছরেও তোমাদের কাছে ধরা পড়েনি। (ঠাকুর, ২০০৭ : ৪৯৯)

নারীর নিজস্ব পরিসর এভাবেই রবীন্দ্রনাথ সন্ধান করার চেষ্টা করেছেন তাঁর কথাসাহিত্যে।

CamScanner

স্ত্রী-শিক্ষা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীমতি লীলা মিত্রের একটি পত্রের জবাবে রবীন্দ্রনাথ 'স্ত্রীশিক্ষা' যে-প্রবন্ধটি রচনা করেন তাতে নারীশিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্র দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিষয়টি ছিল সমকালীন একটা আলোচ্য বিষয়। নারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা। সমকালীন আলোচনার প্রেক্ষিতে লীলা মিত্র স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে এবং বিপক্ষে পুরুষদের যে-রূপ অবস্থান তার উল্লেখ করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে, পুরুষদের মধ্যে একদল তাদের স্ত্রীকে তাদের যোগ্য করে তোলার জন্য স্ত্রীশিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন; আরেকদল আছেন যারা মনে করেন স্ত্রী শিক্ষিত হলে বরং তাদের বিপদ, কারণ তখন তাদের ব্যক্তিগত সুখের বিঘ্ন ঘটবে। আবার একশ্রেণির পুরুষ রয়েছেন যারা কি-না নারী এবং পুরুষ-উভয়ের শিক্ষাদানে সমর্থন করে থাকেন এবং তারা অবশ্য অন্য দশটা পুরুষের পর্যায়ে পড়েন না।

উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, স্বামীরা নিজেদের জন্য শিক্ষিত স্ত্রী ভাবতেই পারেন না। তাদের স্ত্রীরা হবে সন্তানের জননী, সেবাপরায়ণ, অনুগত এবং স্নেহপ্রবণ। গুটিকয়েক শিক্ষিতার ব্যাপারে এ-কথা স্পষ্টতই বলা যায় যে, তাদের স্বামীরা নিজেদের সুবিধার্থে, সমাজে মাথা উঁচু করে চলতে, কাঠের পুতুল স্ত্রীকে শিক্ষিত করে তোলেন। আর তারা শিক্ষাব্যবস্থার এমন একটি আদল তৈরি করে দিয়েছেন যে, নারী শিক্ষিত হয়েও পুরুষের অধীনে থাকবে ঔপানিবেশিক শাসনব্যবস্থার মতো। তবে আর নারী শিক্ষা কেন? কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একে ব্যাখা করেছেন অন্যভাবে। তিনি মনে করেন নারীর একটি কোমল সত্তা থাকবে। নারী হবে সুন্দর ও মনোহরা। তিনি মনে করেন যেহেতু নারী এবং পুরুষ সৃষ্টিলগ্ন থেকেই দুটি আশ্চর্য উদ্ভাবন এবং এ-দুইয়ের দৈহিক এবং আচার-আচরণগত স্বাতন্ত্র্য রয়েছে সেহেতু এই বিষয়টি আমাদের সহজেই মেনে নিতে হবে। কিন্তু এর মাধ্যমে তিনি লিঙ্গ-বৈষম্য তুলে ধরেন নি । 'স্ত্রী-শিক্ষা' প্রবন্ধে এ-বিষয়ে বলেছেন :

> জীবলোকে এই যে একটা ভেদ ঘটিয়াছে এই ভেদের মুখ দিয়া একটা প্রবল শক্তি পরম আনন্দের উৎস উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে। ইস্কুল-মাস্টার কিংবা টেক্সটবুক-কমিটি তাঁহাদের এজেন্সাইজের খাতা কিংবা পাঠ্য ও অপাঠ্য বইয়ের বোঝা দিয়া এই শক্তি এবং সৌন্দর্য প্রবাহের মুখে বাঁধ বাঁধিয়া দিতে পারেন, এমন কথা আমি মানি না। মোটের উপর, বিধাতা এবং ইস্কুল-মাস্টার এই দুইয়ের মধ্যে আমি বিধাতাকে বেশি বিশ্বাস করি। সেইজন্য আমার ধারণা এই যে , মেয়েরা যদি-বা কান্ট-হেগেল্‌ও পড়ে তবু শিশুদের স্নেহ করিবে এবং পুরুষদের নিতান্ত দূর-ছাই করিবে না। (ঠাকুর, ১৪০৭ : ২৮৬)

রবীন্দ্রনাথ এটি স্পষ্ট করে বলেছেন যে, নারীর প্রতি যদি বৈষম্য করা হয় তাহলে ঈশ্বরকেও অবমাননা করা হবে। তাই নারীর মানুষ হয়ে উঠতে প্রয়োজন শিক্ষা এবং তা অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথ এ-কথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু তাই বলে তাদের গ্রন্থগতবিদ্যার অধিকারী হতে হবে এমন কোনো কথা নয়। কারণ রবীন্দ্রনাথ এই তথাকথিত শিক্ষা কিন্তু ঠাকুরবাড়ির ছেলেদের জন্যও ধার্য করতে চান নি! যার ফলে শান্তিনিকেতন হলো। বরং মেয়েদের যথার্থ মেয়ে করে গড়ে তোলার জন্য যে-ব্যবহারিক জ্ঞানের প্রয়োজন তার ওপরও গুরুত্বারোপ করেছেন। মেয়েরা মেয়ে বলেই যে তাদের স্বতন্ত্র রক্ষা করে চলতে হবে এটাও কিন্তু অনেকে বাড়াবাড়ি হিসেবে দেখেন।

CamScanner

রবীন্দ্র স্ত্রীশিক্ষা-ভাবনা প্রসঙ্গে সুশান্ত সরকারের মূল্যায়ন নিম্নরূপ :

> রবীন্দ্রনাথ স্ত্রীশিক্ষা নারীশিক্ষার বিষয়টি নিয়ে ভেবেছেন, শুধু তাই নয় স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা ছিল যা কিছু জানার যোগ্য তাই বিদ্যা, তা পুরুষকেও জানতে হবে, মেয়েকেও জানতে হবে। শুধু কাজে খাটাবার জন্য যে তা নয়, তা জানার জন্যই।...সুতরাং মেয়েদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। তাই বলে তিনি মনে করেননি-শিক্ষা প্রণালীতে মেয়ে-পুরুষ কোনো ভেদ থাকবে। বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চায় মেয়েপুরুষে কোনো পার্থক্য নেই। স্ত্রী হওয়া, মা হওয়া মেয়েদের স্বভাব, দাসী হওয়া নয়-তাই তাকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। (সরকার, ২০১১ : ১৯)

কিন্তু সমাজের ভাবনা ঠিক উলটো, যা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায় নি। এবং পুরুষতান্ত্রিক এ-মনোভাবকেই নারীর মানুষ হয়ে ওঠার পথে প্রধান বাধা বলে তিনি চিহ্নিত করেছেন :

> মানুষকে পুরা পরিমাণে মানুষ করিব এ কথা আমাদের সকলের অন্তরের কথা নয়। যখন সর্বসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব হয় তখন একদল শিক্ষিত লোক বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা চাকর পাইব কোথা হইতে?... মেয়েদের সম্বন্ধে সেই এক কথা যে, তারা যদি লেখোপড়া শেখে তবে সে ঝাঁট বঁটি ও শিলনোড়া বাবুদের ভাগে পড়ে। (ঠাকুর, ১৪০৭ : ২৮৬)

অর্থাৎ, মেয়েদের শিক্ষা দিলে তার পতিভক্তি, হরিভক্তির ব্যাঘাত ঘটবে, ঝাঁটা, বঁটি, শিলনোড়ার কাজটা কে করবে-এই যুক্তিতে মেয়েদের শিক্ষা লাভ থেকে অনেকে বঞ্চিত করতে চান। এই 'অনেকে' বলতে রবীন্দ্রনাথ পুরুষ ও পুরুষতন্ত্রকেই ইঙ্গিত করেছেন। ইঙ্গিত করেছেন সামন্ততন্ত্র ও সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতাকে। স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতায় এরাই পথের কাঁটা। কেননা, আমাদের যে-সমাজব্যবস্থা তাতে তো শিক্ষিত নারীকেও যথার্থ মর্যাদা দেওয়া হয় না। তারা অনেক বিষয় নারীদের ওপর চাপিয়ে দেন; পুরুষরা কর্তৃত্ব করছে সবখানেই নারীরা কেবল আনুগত্য শিখেছে এই বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ সহজভাবে নিতে পারেন নি। বরং এতে সমাজের প্রতি হয়েছেন বীতশ্রদ্ধ। শুধু তাই নয় তিনি এসব নিয়ে সমাজকে কটাক্ষ করেছেন নিষ্ঠুরভাবে।

অন্যদিকে নারীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্নতর। তিনি একজন কবি ও দার্শনিকের দৃষ্টিতে দেখেছেন নারীকে। নারী-পুরুষের সম্পর্ককে যেমন দেখেছেন রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, নারীদের শক্তি ও শিক্ষাকেও দেখেছেন অনেকটা ওই চোখে। এর ফলে বাস্তাববাদীদের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের একটা সংঘাত তৈরি হয়। কিন্তু রবীন্দ্র শিক্ষাচিন্তার দার্শনিক ভিত্তি বুঝে নিলে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে রবীন্দ্রচিন্তার ভুল ব্যাখ্যার অবকাশ থাকে না। এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন :

১. মেয়েদের মানুষ হইতে শিখাইবার জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা চাই, কিন্তু তার উপরে মেয়েদের মেয়ে হইতে শিখাইবার জন্য যে ব্যবহারিক শিক্ষা তার একটা বিশেষত্ব আছে, একথা মানিতে দোষ কী? (ঠাকুর, ১৪০৭ : ২৮৬)

২. পুরুষ এতদিন কেবলমাত্র গায়ের জোরেই মেয়েদের কাঁধের উপর এই অনুগত্যটা চাপাইয়া দিয়াছে। জগতের সর্বত্রই এই কথাটা যদি এতদিন ধরিয়া সত্য হইয়া থাকে, যদি মেয়েদের প্রকৃতির বিরুদ্ধে পুরুষের শক্তি তাহাদিগকে সংসারের তলায় ফেলিয়া রাখিয়া থাকে তবে বলিতে হইবে,

CamScanner

দাসত্বই মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক। দাসত্ব বলিতে এই বোঝায়, দায়ে পড়িয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরের দায় বহন করা। যাদের পক্ষে এটা প্রকৃতিসিদ্ধ নয়, তারা বরঞ্চ মরে তবু এমন উৎপাত সহ্য করে না। (ঠাকুর, ১৪০৭ : ২৮৭)

৩. কিন্তু তাই বলিয়া এ কথাটা উড়াইয়া দেওয়া যায় না যে, সমাজে মেয়েরা যে ব্যবহারের ক্ষেত্রটি অধিকার করিয়াছে সেখানে স্বভাববশতই তারা আপনি আসিয়া পৌঁছিয়াছে, বাহিরের কোনো অত্যাচার তাহাদিগকে বাধ্য করে নাই। (ঠাকুর, ১৪০৭ : ২৮৮)

এসব বক্তব্য ও যুক্তিতর্ক স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন আমরা উপলব্ধি করি রবীন্দ্র জীবনদর্শনের গভীরতর দিক। যার প্রকাশ ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের কবিতা, নাটক, গান, কথাসাহিত্য, প্রবন্ধ, ভাষণ এবং অবশ্যই তাঁর শিক্ষাচিন্তায়। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের দুটি মূল বিষয় হলো মুক্তি ও আনন্দ। তাঁর সাহিত্যকর্ম থেকে এ-দুই বিষয়ে এ-ব্যাপারে বিস্তৃত জানা যায়। রবীন্দ্রনাথের মতে, 'মেয়েদের শরীরের এবং মনের প্রকৃতি পুরুষের হতে স্বতন্ত্র' বলে 'তাদের ব্যবহারের ক্ষেত্র স্বভাবতই স্বতন্ত্র'। নারীরা সন্তান-ধারণ ও প্রতিপালন করে। স্নেহ-প্রেম তাদের মজ্জাগত। সে-কারণেই 'মেয়েদের সংসারে কোনো কারণে যেখানে তাদের ভালোবাসা নাই সেখানেও তাহাদিগকে সমাজ ভালোবাসার আদর্শেই বিচার করিয়া থাকে।' (ঠাকুর, ১৪০৭ : ২৮৮) অন্যদিকে ভালোবাসার ধর্মই আত্মসমর্পণে, এবং তার গৌরবও তাতেই। সুতরাং যেটাতে আনুগত্য বলে লজ্জা করা হচ্ছে সেটা লজ্জার বিষয় হয় যদি তাতে প্রীতি না থাকে। অর্থাৎ,

> মেয়েরা আপনার স্বভাবের দ্বারাই সমাজে এমন একটা জায়গা পাইয়াছে যেখানে সংসারের কাছে তারা আত্মসমর্পণ করিতেছে। যদি কোনো কারণে সমাজের এমন অবস্থা ঘটে যাতে এই আত্মসমর্পণ ভালোবাসার আদর্শ হইতে বহুল পরিমাণে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাহা মেয়েদের পক্ষে পীড়া ও অবমাননা। (ঠাকুর, ১৪০৭ : ২৮৮)

রবীন্দ্রনাথ এও মনে করেন, মেয়েরা স্বভাবতই ভালোবাসে এবং একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণের আদর্শকেই সামাজিক শিক্ষায় তাদের মনে বদ্ধমূল করে দিয়েছে, এই সুবিধাটুকু ধরে অনেক পুরুষ তাদের প্রতি অত্যাচার করে। শুধু তাই নয়, তাঁর মতে, সমাজে পুরুষের দাসত্ব মেয়েদের চেয়ে অল্প নয়, বরং বেশি। কেননা সভ্যতাব্যাপী পুরুষ এমন দায় বহন করে চলেছে যেখানে প্রীতি বা সৌন্দর্য কোনোটাই নেই। যেটা নারীর ভেতরে মজ্জাগতভাবে বিদ্যমান। সে-দৃষ্টিকোণ থেকেই রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের পুরুষ নয়, মেয়েদের মেয়ে হয়ে উঠবার শিক্ষার কথা বার বার উচ্চারণ করেছেন, যেখানে প্রকৃতি তার ভারসাম্য রক্ষা করে।

উপসংহার

ঔপনিবেশিক সমাজ, সামন্তবাদী পুরুষতান্ত্রিক শিক্ষা এবং সমাজব্যবস্থার প্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের নারীচিন্তা ছিল চিরন্তন। তিনি নারীকে দেখেছেন মানবীরূপে, যে-নারীর মধ্যে মায়া, মমতা, মাতৃত্ব এবং সহনশীলতা থাকবে। নারীর এই ক্ষেত্রগুলো তো পুরুষ পরিপূর্ণ করতে পারে না। স্ত্রীশিক্ষার বিপক্ষে ছিলেন না রবীন্দ্রনাথ, বরং তিনি বলেছেন 'মানুষ জানিতে চায়, সেটা তার ধর্ম; এইজন্য জগতের আবশ্যক সকল তত্ত্বই তার কাছে বিদ্যা হইয়া উঠিয়াছে।

সেই তার জানিতে চাওয়াকে যদি খোরাক না জোগাই কিংবা তাবে কুপথ্য দিয়া ভুলাইয়া রাখি তবে তার মানব প্রকৃতিকেই দুর্বল করি, একথা বলাই বাহুল্য ।' (ঠাকুর, ১৪১০ : ২৮৬) মন্তব্যটি নারী-পুরুষ উভয়কে উদ্দেশ্য করেই বলা । সেদিক থেকে জীবনের একটা সময়ে হয়ত রবীন্দ্রনাথ স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে নীবর ভূমিকা পালন করেছেন কিন্তু পরিণত বয়সে এসে তিনি আন্তরিকতার সঙ্গেই স্ত্রীশিক্ষাকে গ্রহণ করেছেন এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন । শুধু তাই নয় শিক্ষাপ্রণালিতে মেয়ে পুরুষে বিভেদকে বিধাতাকে অমান্য করার সমতুল্য ভেবেছেন । বরং মেয়েদের 'মেয়ে হিসেবে' গড়ে তোলার জন্য 'বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা'র চেয়ে 'ব্যবহারিক শিক্ষা'র প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন । শুধু তাই নয় শিক্ষাপ্রণালিতে মেয়ে পুরুষে বিভেদকে বিধাতাকে অমান্য করার সমতুল্য ভেবেছেন । বরং মেয়েদের 'মেয়ে হিসেবে' গড়ে তোলার জন্য 'বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা'র চেয়ে 'ব্যবহারিক শিক্ষা'র প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন আর মানুষ হয়ে ওঠার জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষার কথা বলেছেন । কেননা, যেখানে বিশুদ্ধ জ্ঞান সেখানে নারী-পুরুষের পার্থক্য নেই, কিন্তু যেখানে ব্যবহার সেখানে পার্থক্য আছেই । আর এখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অনেকের দ্বিমত । কিন্তু রবীন্দ্র জীবনদর্শনের দিক থেকে তা যথার্থ হিসেবে আমরা মনে করি ।

তথ্যনির্দেশ

ঘোষ, সুদক্ষিণা (২০১৫) । 'রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনা' । সাপ্তাহিক আজকাল (৭/৮/১৫) । সম্পা.: মনজুর আহমেদ । নিউ ইয়র্ক;

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৮৯) । 'শিক্ষাচিন্তা' । রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ । সম্পা. : সত্যেন্দ্রনাথ রায় । কলকাতা;
- (১৪১৭) । 'স্ত্রী-শিক্ষা' । রবীন্দ্র রচনাবলী (খণ্ড-১৬) । কলকাতা : বিশ্বভারতী;
- (১৪১৭) । 'অসন্তোষের কারণ' । রবীন্দ্র রচনাবলী (খখণ্ড-১৬) । কলকাতা : বিশ্বভারতী;
- (১৪১৭) । শিক্ষা । রবীন্দ্র রচনাবলী (খণ্ড-১৬) । কলকাতা : বিশ্বভারতী;
- (২০০৭) । 'স্ত্রীর পত্র' । গল্পগুচ্ছ । ঢাকা : প্রতীক;

দেব, চিত্র (২০১৪) । ঠাকুর বাড়ির অন্দরমহল । কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স;

মামুদ, হায়াৎ (২০১১) । রবীন্দ্রনাথ, অধরা মাধুরী । ঢাকা : শুদ্ধস্বর ২০১১;

মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার (২০১১) । কালের পুত্তলিকা : বাংলা ছোটগল্পের একশ' বিশ বছর (১৮৯১-২০১০) । কলকাতা : দেজ;

মোমেন, আবুল (২০১২) । 'মানবের বিকাশ ও রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শ' । রবীন্দ্রনাথ : এই সময়ে । সম্পা. আনিসুজ্জামান । ঢাকা : প্রথমা;

সরকার, সুশান্ত (২০১১) । রবীন্দ্রভাবনার পঞ্চ প্রান্তর । ঢাকা শুদ্ধস্বর;

সেন, পুলিনবিহারী (২০১২) । 'সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাংলার স্ত্রী-স্বাধীনতার অন্যতম পথিকৃৎ' । পুরাতনী ।

সম্পা. : ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী । কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স ।

CamScanner

তাছনিম আক্তার*

শিক্ষাসমস্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ : একটি পর্যালোচনা

সারসংক্ষেপ : *ভারতবর্ষের ইতিহাস, ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা এবং শিক্ষার প্রতি সমাজদৃষ্টির নিবিড় বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাচিন্তা বিষয়ক প্রবন্ধগুলোতে। রবীন্দ্র মননে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ উন্মোচন, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের যোগ, মানুষের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির যোগ, চিন্তাশক্তি কল্পনাশক্তির মিলন, ভাষার সঙ্গে ভাবের যোগ, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা, অর্থাৎ জীবনপ্রবাহের গতির সঙ্গে শিক্ষাকে এক অক্ষে রেখে শিক্ষামুখী জীবন নয়, জীবনমুখী শিক্ষা প্রদান করা। একই লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভবিষ্যতের জন্য বিশ্বজাগতিক মহামিলন যজ্ঞের কেন্দ্র করে নির্মাণ করেছেন শান্তিনিকেতন ও বিশ্ব ভারতী। মিলনের এই মহাযজ্ঞের মঞ্চে তিনি বিদ্যাদানের কথা কমই বলেছেন, সারাজীবন বলে গেছেন শিক্ষার কথা। কেননা, বিদ্যা আর শিক্ষা দু'টোকে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ আলাদা করে দেখেছেন। বিদ্যা আহরণের বস্তু, কিন্তু শিক্ষার আচরণের। অর্জিত বিদ্যার সঙ্গে মানসিক উৎকর্ষ ঘটানো শিক্ষার কাজ। কিন্তু আমাদের দেশীয় শিক্ষা প্রণালীতে চিত্তের গতিকে মূল্যয়ন না করে সনাতন পদ্ধতির ভেতরে আমদানি করা হয়েছে বিলেতি বিদ্যা। বিলেতি বিদ্যা ভারতবর্ষের সমাজ, সংস্কৃতি ও আলো বাতাসের সঙ্গে খাপ না খাওয়া সত্ত্বেও সভ্য হওয়ার বাসনায় বিদ্যার এই আমদানি। শিক্ষার এরূপ যান্ত্রিকতাকে রবীন্দ্রনাথ কখনো পছন্দ করতেন না। যান্ত্রিক শিক্ষায় প্রতিটি মানুষ কলে ছাঁটা বিদ্যা নিয়ে জীবনের অর্ধেক সময় পাঠ মুখস্ত করার মধ্যে দিয়ে পার করে দেয়। বিদ্যাদানের অভিনব কৌশল স্বরূপ আমদানি করা বিলেতি স্কুলের ধারণাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, শিক্ষা দানের কল। স্কুলের মাস্টার এই কলের একটা অংশ। বিদ্যা কলে উৎপন্ন হতে পারে বিদ্যার পণ্য কিন্তু চলনশীল মন ও প্রাণের যোগ না থাকায় বিদ্যার এই কলে শিক্ষা উৎপন্ন হয় না। তাই ইউরোপীয় বিদ্যালয়ের অবিকল নকল না করে আমাদের সমাজের সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে, আমাদের দেশীয় শিক্ষাকে সংলগ্ন করে তুলেতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিলেতের বিদ্যালয়ের নজির একবারে এড়িয়ে যেতে হবে, কেননা বিলাতের ইতিহাস, বিলাতের সমাজের সাথে আমাদের সমাজ-ইতিহাসের তেমন কোনো মিল নেই। এজন্যই বিদ্যালয়ের এদেশীয় প্রতিরূপটি কেমন করে আমাদের জীবনের সঙ্গে মিলেয়ে নেওয়া যায় তার একটি স্বচ্ছ পন্থা বের করতে হবে। শিক্ষাকে চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ না করে, গেইট দ্বারা রুদ্ধ না করে, দারোয়ান দ্বারা পাহারা না বসিয়ে, সময় দ্বারা তাড়া না করে, শাস্তি দ্বারা কণ্ঠকিত না করে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাদানের জন্য গুরুগৃহ তপোবন প্রত্যাশ্যা করেছেন। আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করতে হয় তবে লোকালয় থেকে দূরে, নির্জনে, মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যেই তার ব্যবস্থা করতে হবে। যেখানে গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে ছাত্ররা জ্ঞানচর্চার মহামিলন যজ্ঞের মধ্যে হয়ে উঠবে। কিন্তু আমাদের দেশের কলে ছাঁটা বিদ্যার কারণে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মাস্টারমশাই হয়ে উঠেন, গুরু হতে পারেন না। এইসব মাস্টারমশাই হলেন শিক্ষার দোকানদার, তারা শিক্ষা নামের পণ্যকে বেতন গ্রহণের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করেন। এমতাবস্থায় বেতন-ভোগী দোকানী মাস্টারমশাই দ্বারা চালিত বিদ্যালয় ইঞ্জিনে পরিনত নয়। তাতে বস্তু উৎপন্ন হতে পারে কিন্তু প্রাণ উৎপন্ন হয় না। তাই রবীন্দ্রনাথের মতে কোনো বহিরাগত নিয়ম, বিধি বা প্রণালি নয় ভারতবর্ষের ইতিহাস, সমাজ, পরিবেশের সাথে সাম্যঞ্জস্য করে শিক্ষাদান করতে হবে। যেখানে নিভৃতে তপোস্যা হয়, যেখানে গোপনে ত্যাগ এবং সাধন করে শক্তিলাভ করা যায়, যেখানে অধ্যাপকেরা জ্ঞানচর্চায় প্রবৃত্ত সেখানে ছাত্ররা সম্পূর্ণভাবে শিক্ষাকে প্রত্যক্ষ করে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হতে পারে। 'শিক্ষাসমস্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ : একটি পর্যালোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার এই বিশেষ দিকটি উন্মোচনের চেষ্টা করা হয়েছে।*

*স্নাতকোত্তর (অবতীর্ণ) শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট, বাংলাদেশ

CamScanner

পরাধীন ভারতবর্ষের স্বরাজ, স্বাধীনতা, দৈন্য-দুর্গতি, পশ্চাৎপদতার সত্যানুসন্ধান করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপমহাদেশটিতে মূল সমস্যা নীতি-নিয়মের আধিক্য লালিত শিক্ষাব্যবস্থায়ও স্থিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মননে এবং তাঁর সমগ্র সৃষ্টিশীল সাহিত্যে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার অসারতার বিপরীতে যুক্তিশীল, বুদ্ধিদীপ্ত, উদার দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষার অবকাঠামো নির্মিত হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলি। বিজ্ঞানের দুইটি বিশিষ্ট উপাদান যুক্তি ও বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতবর্ষের ইতিহাস-সংস্কৃতি-ভাষা-সাহিত্য প্রভৃতির উপযোগী করে এবং বৈশ্বিক চিন্তার সৃজনী প্রতিভার সমন্বয়ে নির্মাণ করেছিলেন একটি স্বতন্ত্র শিক্ষাপ্রণালী। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত এই শিক্ষাপ্রণালীর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ উন্মোচন, ব্যক্তির সঙ্গে স্বদেশের মাটি ও মানুষের যোগ, মানুষের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির যোগ, বইভিত্তিক পাঠদানের সঙ্গে তপস্যার যোগ, স্মরণশক্তির সঙ্গে কল্পনা ও চিন্তাশক্তির যোগ, ভাষার সঙ্গে ভাবের যোগ, বিজাতীয় ভাষা নয় মাতৃভাষার সঙ্গে শিক্ষাদানের ভাষার যোগ প্রভৃতি। অর্থাৎ জীবন প্রবাহের গতির সঙ্গে শিক্ষাকে এক অক্ষে রেখে শিক্ষামুখী জীবন নয়, জীবনমুখী শিক্ষা প্রদানের ওপর জোর দিয়েছেন। একই লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভবিষ্যতের জন্য বিশ্বজাগতিক মহামিলন যজ্ঞের কেন্দ্র হিসেবে নির্মাণ করেছেন শান্তিনিকেতন (১৯০১) ও বিশ্বভারতী (১৯১৮)। এ প্রসঙ্গে খান সারওয়ার মুরশিদ বলেছেন :

> রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে শিক্ষা বিষয়ে ভেবেছেন, লিখেছেন, নিজে শিক্ষকতা করেছেন এবং শিক্ষার যে আদর্শ তিনি অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন তা রূপায়নের জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। বিশ্বভারতী তাঁর অনেক কামনার এবং আশার প্রতীক। (মুরশিদ, ১৯৯৫ : ১৫)

মিলনের এই মহাযজ্ঞের মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাদানের কথা কমই বলেছেন, সারাজীবন বলে গেছেন শিক্ষার কথা। কেননা বিদ্যা আর শিক্ষা দু'টোকে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ আলাদা করে দেখেছেন। বিদ্যা আহরণের বস্তু কিন্তু শিক্ষা আচরণের। অর্জিত বিদ্যার সঙ্গে মানসিক উৎকর্ষ ঘটানো শিক্ষার কাজ। কিন্তু আমাদের দেশীয় শিক্ষাপ্রণালীতে চিত্তের গতিকে মূল্যায়ন না করে আমদানি করা হয়েছে বিলেতি বিদ্যা। বিলেতি বিদ্যা ভারতবর্ষের সমাজ, সংস্কৃতি, আলো-বাতাসের সঙ্গে খাপ না খাওয়া সত্ত্বেও সভ্য হওয়ার বাসনায় বিদ্যার এই আমদানি।

শিক্ষার এরূপ যান্ত্রিকতাকে রবীন্দ্রনাথ কখনোই সমর্থন করেন নি। যান্ত্রিক শিক্ষায় প্রতিটি মানুষ কলে ছাঁটা বিদ্যা নিয়ে জীবনের অর্ধেক সময় পাঠ মুখস্থ করার মধ্য দিয়ে পার করে দেয়। পাঠ্য বইয়ের এরূপ মুখস্থ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জীবনের কোনো যোগ না থাকায় বইয়ের বিদ্যা বইয়েই থেকে যায়, তা জীবনের পক্ষে শিক্ষার যথার্থতা নিয়ে সংযুক্ত হতে পারে না বলে মত দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিক্ষা সমস্যা' প্রবন্ধে। আজও পর্যন্ত চালিত বিদ্যাদানের অভিনব কৌশল স্বরূপ আমদানি করা বিলেতি স্কুলের ধারণা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষা সমস্যা' প্রবন্ধে আরও বলেছেন :

> ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাস্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাস্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাস্টার কল তখন মুখ বন্ধ করেন, ছাত্ররা দুই-চারপাতা কলে-ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে। তারপর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপরে মার্কা পড়িয়া যায়। (ঠাকুর, ২০০০ : ৬৭৭)

CamScanner

আমদানিকৃত বিলেতি বিদ্যার কলে উৎপন্ন হতে পারে বিদ্যার পণ্য কিন্তু চলনশীল মন, আনন্দহীন শিক্ষা ও প্রাণের যোগ না থাকায় বিদ্যার এই কলে শিক্ষা উৎপন্ন হয় না। অপরদিকে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় এই ধারণাগুলো ইউরোপীয়। ইউরোপের সাথে আমাদের ইতিহাস-সমাজ-সংস্কৃতির সাযুজ্য না থাকায়, ইউরোপের বিদ্যার নকল দ্বারা প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের কোনো উপকারে আসছে না এবং ইউরোপের বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেসব সৃজনশীল মানুষ বের হচ্ছে, তারা ইউরোপীয় সমাজের ভেতর থেকেই মানুষ। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় তাদের যৎসামান্যই সাহায্য করছে বলে 'শিক্ষা সমস্যা' প্রবন্ধে বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। শিক্ষাভাবনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতকে আমলে নিয়ে যদি বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব ধুম পড়েছে ইউরোপীয় বিদ্যাদানের, যেখানে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে ইংরেজি ভাষায়। কিন্তু ইংরেজি ভাষাশিক্ষার সঙ্গে ভাবশিক্ষা দেওয়া হচ্ছে না। মাস্টার ছাত্র ভাবশিক্ষার মাধ্যমে ভাষার রস আস্বাদন করতে অনাগ্রহী। তাদের একমাত্র লক্ষ্য টানিয়া-বুনিয়া কোনো মতে একটা অর্থ বুঝে পরীক্ষায় পাস করতে হবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চাকরি জোটাতে হবে। এক্ষেত্রে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, যে ইউরোপের অনুকরণে আমরা আজো পর্যন্ত মত্ত, সেই ইংরেজ জাতির জ্ঞানে-বিজ্ঞানে-অর্জনে অগ্রগতির একমাত্র কারণ হচ্ছে স্বদেশের সমাজ-ইতিহাস-ঐতিহ্য-সাহিত্য নির্ভর শিক্ষা, যে শিক্ষা প্রতিনিয়ত যোগ হচ্ছে জীবনের সঙ্গে। এই স্থলে আমরা ইউরোপের অবিকল নকলে ব্যস্ত, কিন্তু এই নকল দ্বারা নতুন কিছু নির্মাণ হয় না, কেবলই গ্রহণের বোঝা বাড়ে এবং সৃষ্টি হয় মানসিক দাসত্ব। এই মানসিক দাসত্বের কারণে আজও আমাদের ইংরেজ প্রীতি দূর হয় নি, যার ফলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৭০ বছর এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৪৬ বছর পার হলেও আমাদের উচ্চশিক্ষাঙ্গনে শিক্ষাদান মাতৃভাষার মাধ্যমে করা সম্ভব হয় নি। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ 'শিক্ষার হেরফের', 'শিক্ষার বাহন', 'শিক্ষাবিধি' সহ অন্যান্য প্রবন্ধে এবং প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্য ভ্রমণ কাহিনি সম্বলিত নানা গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন। 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের যথার্থতা উল্লেখ করে বলেছেন :

> উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা যদি বা আমরা পাই উচ্চ-অঙ্গের চিন্তা আমরা করি না। কারণ চিন্তার স্বাভাবিক বাহন আমাদের ভাষা। বিদ্যালয়ের বাহিরে আসিয়া পোশাকি ভাষাটা আমরা ছাড়িয়া ফেলি, সেই সঙ্গে তার পকেটে যা কিছু সঞ্চয় থাকে তা আলনায় ঝোলানো থাকে, তার পরে আমাদের চিরদিনের আটপৌরে ভাষায় আমরা গল্প করি , গুজব করি, রাজা-উজির মারি, তর্জমা করি, চুরি করি এবং খবরের কাগজে অশ্রাব্য কাপুরুষতার বিস্তার করিয়া থাকি। এ সত্ত্বেও আমাদের দেশে বাংলা সাহিত্যের উন্নতি হইতেছে না এমন কথা বলি না, কিন্তু এ সাহিত্যে উপবাসের লক্ষণ যথেষ্ট দেখিতে পাই। যেমন, এমন রোগী দেখা যায় যে খায় প্রচুর তার হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তেমনি দেখিতে আমরা যতটা শিক্ষা করিতেছি তার সমস্তটা আমাদের সর্বাঙ্গে পোষণ সঞ্চার করিতেছে না। খাদ্যের সঙ্গে আমাদের প্রাণের সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ হইতেছে না। তার প্রধান কারণ আমরা নিজের ভাষার রসনা দিয়া খাই না, আমাদের কলে করিয়া খাওয়ানো হয়, তাতে আমাদের পেট ভর্তি করে, দেহপূর্তি করে না। (ঠাকুর, ১৯৯৫ : ৫১৬)

তাই দেখা যায় দেশের বিশ্ববিদ্যলয় থেকে আমরা যে শিক্ষালাভ করি এতে জীবন মন ও আত্মার বিকাশ ঘটে না-আমাদের আচার ও আচরণে শিক্ষার কোনো লক্ষণই প্রকাশিত হয় না। আমরা সবাই একই কলের ছাঁদে তৈরি হই মানুষ হই না।

CamScanner

শিক্ষক রবীন্দ্রনাথের সহজ দৃষ্টিতে শিক্ষাপদ্ধতির যেসব সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে, তার মধ্যে শিক্ষার অস্বাভাবিকতা ও আনন্দহীনতাই প্রধান। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি আনন্দহীন কেননা তা অস্বাভাবিক, কারণ মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন নয়। মাতৃভাষার রস বঞ্চিত শিক্ষা দ্বারা শিক্ষার্থীর অন্তর অপুষ্টই থেকে যায়। 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, শিক্ষা জিনিসটা মানসিক আহার ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা, জীবন বাঁচানোর জন্য খাদ্যের প্রয়োজন, কিন্তু সেই খাদ্যটা হজমের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ হাওয়া খাওয়া দরকার। খাদ্যের এই উদ্বৃত্ত অংশ অর্থাৎ হাওয়া খাওয়াকে শিক্ষাক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, শিক্ষার ঐশ্বর্য। এই ঐশ্বর্যের অভাবে আমাদের সমস্ত জীবন ব্যয় করা বিদ্যা জীবন ও জগতের কোনো কাজে আসে না। যদিও রবীন্দ্রনাথের এ বক্তব্যের সঙ্গে বিষয়ী ও প্রবীণেরা ভিন্নমত পোষণ করেন। কারণ তারা বলবেন এই কলে ছাঁটা বিদ্যার দ্বারাই আমরা বড়ো চাকুরে হতে পেরেছি, মোটা অঙ্কের বেতন পাচ্ছি এটাই তো সার্থকতা। কলে ছাঁটা এই বিদ্যাধারীদের বিদ্যাদানের সমস্ত প্রণালির মধ্যে নকলের এত প্রাচুর্য যে তাদের মধ্যে স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা, সমাজের প্রতি কোনো দায়ভার সৃষ্টি হয় না। নিজ দেশ-সমাজ-ইতিহাস-সংস্কৃতি-ভাষা সাহিত্যের প্রতি দায়ভার সৃষ্টি করাও ছিল রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য। 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে স্বাধীন পাঠ্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেছেন :

> যতটুকু আবশ্যক কেবল তাহারই মধ্যে কারারুদ্ধ হইয়া থাকা মানবজীবনের ধর্ম নহে। আমরা কিয়ৎ পরিমাণে আবশ্যকশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া থাকি এবং কিয়ৎ পরিমাণ স্বাধীন। আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে বদ্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া ঠিক সেই তিন হাত পরিমাণ গৃহ নির্মাণ করিলে চলে না। স্বাধীন চলাফেরারর জন্যে অনেকখানি স্থান রাখা আবশ্যক, নতুবা আমাদের স্বাস্থ্য এবং আনন্দের ব্যাঘাত হয়। শিক্ষা সম্বন্ধেও একই কথা ঘটে। যতটুকু কেবলমাত্র শিক্ষা অর্থাৎ অত্যাবশ্যক তাহারই মধ্যে শিশুদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনোই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না। অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে বালক থাকিয়াই যায়। (ঠাকুর, ২০০০ : ৬৬৬)

যে-শিক্ষায় আনন্দ নেই, প্রাণ নেই আর যে শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে আত্মস্থ না করে শুধু তোতাপাখির মতো কতগুলো নিরস বুলি মুখস্থ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ রবীন্দ্রনাথ এ-শিক্ষাকে বলেছেন কৃত্রিম ও গোলামির শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথ কৃত্রিম এই শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে আরও বলেছেন :

> আমাদের নিরস শিক্ষায় জীবনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ অতীত হইয়া যায়। আমরা বাল্য হইতে কৈশোর এবং কৈশোর হইতে যৌবনে প্রবেশ করি কতগুলো কথার বোঝা টানিয়া। সরস্বতী সাম্রাজ্যে কেবলমাত্র মজুরি করিয়া মরি, পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যায় এবং মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ হয় না। যখন ইংরেজি ভাব রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করি তখন আর সেখানে তেমন যথার্থ অন্তরঙ্গের মতো বিহার করিতে পারি না। যদি বা ভাবগুলো একরূপ বুঝিতে পারি কিন্তু সেগুলোকে মর্মস্থলে আকর্ষণ করিয়া লইতে পারি না। বক্তৃতায় এবং লেখায় ব্যবহার করি, কিন্তু জীবনের কার্যে পরিণত করিতে পারি না। (ঠাকুর, ২০০০ : ৬৬৯)

জ্ঞান মানুষকে উদার করে, সংকীর্ণতা হতে, হীনম্মন্যতা হতে, ক্ষুদ্র গণ্ডি হতে, ক্ষুদ্র বুদ্ধি হতে জগতে ও আলোকে টেনে নেয়। কিন্তু আজ আমরা যে শিক্ষা পাই সে শিক্ষায় দিন দিন আমরা শিকড়চ্যুত হয়ে, দেশ, মাটি এবং দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ছি। রবীন্দ্রনাথ শিকড়চ্যুত শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে বলেছেন :

CamScanner

কিন্তু শিক্ষার এই পদ্ধতির কারণস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের দোষারোপ করেন নি। কেননা ছাত্রদের গ্রন্থজগত এক প্রান্তে এবং বসতিজগত অন্যপ্রান্তে, মাঝখানে কেবল ব্যাকরণ-অভিধানের সেতু। ব্যাকরণ-অভিধানের এই ব্যবধান ঘুচিয়ে যথার্থভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে ভাষাশিক্ষার কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যাতে করে শিক্ষার্থীর চিন্তা ও কল্পনাশক্তির স্বাধীন বিকাশের মাধ্যমে নতুনত্বের স্বাদ পাবে এবং তাদের মানসিক দাসত্বও ঘুচবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর চিন্তা দ্বারা কখনোই পাশ্চাত্য শিক্ষা বা ইউরোপীয় শিক্ষার প্রতি কটাক্ষ করেন নি। 'শিক্ষাসমস্যা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন বিলেতি বিদ্যাকে পরিহার করতে, সেই সঙ্গে বিদ্যালয়ের এদেশীয় প্রতিরূপটি কেমন করে আমাদের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায় তারও একটি উপর্যুক্ত পন্থা বের করতে হবে। আমাদের শিক্ষা যে একদিন মাটি, মানুষ ও জীবনের অনুষঙ্গ ছিল তারই দ্বারস্থ হতে বলেছেন তিনি। শিক্ষাকে প্রাচীর বদ্ধ করার পক্ষপাতী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর মতে শিক্ষাকে গেইট দ্বারা রুদ্ধ না করে, দারোয়ান দ্বারা পাহারা না বসিয়ে, সময় দ্বারা তাড়া না করে, শাস্তি দ্বারা কণ্ঠকিত না করে বিশ্বপ্রকৃতির আতিথ্যেই বিশালতার মধ্যেই বাল্যকাল থেকেই লালিত হবে শিক্ষার্থীরা। রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের সমর্থন করে সফিউদ্দিন আহমদ বলেছেন :

> দেশকে ভালোবাসা মানে দেশের ভাষা ও সাহিত্যকেও ভালোবাসা। কিন্তু আমরা মুখে দেশপ্রেমের কথা বলি আবার সর্বক্ষেত্রেই সাহেবীপনার বাহাদুরীও করে থাকি। অথচ দেশের ভাষা ও সাহিত্যকে অপাঙ্‌ক্তেয় করে রাখি। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি ভাষার বিরোধিতা করেননি। যেখানে ইংরেজির প্রয়োজন ও আবশ্যক সেখানে তিনি অবশ্য ইংরেজি ব্যবহারের পক্ষে। (আহমদ, ১৯৯৯ : ৭৫)

তাইতো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষাদানের জন্য গুরুগৃহ এবং তপোবন প্রত্যাশী। গুরুগৃহে ছাত্ররা ব্রহ্মচর্যা পালনের মাধ্যমে শিক্ষালাভ করবে, কিন্তু আজকাল ব্রহ্মচর্যা পালনের নামে নীতি-পাঠের যে আধিক্য তার বিরোধিতা করেছেন তিনি। কেননা ব্রহ্মচর্যা পালন করা মানে উপদেশ পালন করা নয়। ব্রহ্মচর্যা পালনের দ্বারা বিশ্বপ্রকৃতির আনুকূল্যে থেকে আকাশের মতো বিশাল হতে, তরুর মতো উদার হতে, বায়ুর মতো নির্মল হতে, জলাশয়ের মতো স্বচ্ছ হওয়ার শক্তি লাভ করা যায়। বিশ্বপ্রকৃতির এই অতুলনীয় আতিথ্য পাঠ্যবই, চেয়ার, টেবিল, বোর্ড প্রভৃতির চেয়ে কম অত্যাবশ্যক বলে মনে করেন নি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন সম্পর্কে অজয় রায় যে-মন্তব্যটি করেছিলেন তা এখানে উল্লেখ করছি :

> রবীন্দ্রনাথই সম্ভবত একক যিনি শুধু, জীবনবোধসিক্ত করার কথা ভাবেননি, একে বাস্তব রূপ দেবার জন্য একটি... বিদ্যায়তনও গড়ে তুলেছেন-যার নাম শান্তিনিকেতন। আনন্দ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বিদ্যাচর্চার যে ব্যবস্থা তিনি করাতে চেয়েছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যাচর্চা ও জীবনচর্চাকে একাত্ম করে তুলতে। রবীন্দ্রনাথের কাছে বিদ্যাচর্চা হলো জীবনচর্চার অপর নাম। তাই শান্তিনিকেতনকে ঘিরে এক জীবনে তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন- যে জীবন থেকে শুধু জ্ঞানার্থী ছাত্র-ছাত্রীরা জ্ঞান লাভ করবে না শিক্ষাকরাও শিখবে।... একই উদ্দেশ্যে তিনি গড়ে তুলেছেন শ্রীনিকেতন। শ্রীনিকেতন হলো রবীন্দ্র শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োগকেন্দ্র, যেন গবেষণাগার শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন মিলে শিক্ষা ও জীবন যেন পরস্পরকে ধারণ করে রাখার প্রয়াস। আবার প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষাদান ব্যবস্থাকেও তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি। তাই শেষ পর্যন্ত বিশ্বভারতী গড়ে উঠলো যা বিশ্ব মানবতার জন্য উন্মুক্ত আর এই ত্রয়ীর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সার্বিক শিক্ষাব্যবস্থার সার্থকতা, যার মাধ্যমে বিদ্যা ও শিক্ষা জীবনকে স্পর্শ করতে জ্ঞান ও বিদ্যা মানবতাবোধকে, তার সৃজনশীলতাকে ধারণ করবে। এই তো রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শন। (রায়, ১৯৯৫ : ১২)

CamScanner

তাই রবীন্দ্রনাথের মতে, আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করতে হয় তবে লোকালয় থেকে দূরে, নির্জনে, মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যেই তার ব্যবস্থা করতে হবে। যেখানে গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে ছাত্ররা জ্ঞানচর্চার মহামিলন যজ্ঞের মধ্যে বড় হয়ে উঠবে। কিন্তু আমাদের দেশের কলে ছাঁটা বিদ্যার কারণে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মাস্টারমশাই হয়ে উঠেন, গুরু হতে পারেন না। এইসব মাস্টারমশাইরা হলেন শিক্ষার দোকানদার, তারা শিক্ষানামের পণ্যকে বেতন গ্রহণের মাধ্যমে ক্রয় বিক্রয় করেন। এমতাবস্থায় বেতন ভোগী দোকানি মাস্টারমশাই দ্বারা চালিত বিদ্যালয় ইঞ্জিনে পরিণত হয়। তাতে বস্তু উৎপন্ন হতে পারে কিন্তু প্রাণ উৎপন্ন হয় না। প্রাণের এই আবেগ এবং চলনশীল মনের অভাবে শিক্ষার আদান প্রদানে কোন আনন্দ থাকে না। আনন্দহীন বস্তু নির্জীব ও শুষ্ক। এইরূপ প্রতিকূল অবস্থাতেও অনেক শিক্ষক আছেন যাঁরা আপন মাহাত্ম্য গুণে দেনা-পাওনার সম্বন্ধ ছাড়িয়ে যান। তাদেরকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন গুরু। শিষ্য ব্রহ্মচর্যা পালন করে শিক্ষা সমধান করবে বলে মনে করেন রবীন্দ্রনাথ। কালে কালে আমাদের অবস্থার যতই পরিবর্তন হোক না কেন, এই শিক্ষানিয়মের উপযোগিতার কিছুমাত্র হ্রাস হবে না। কারণ এ নিয়ম মানব চরিত্রের নিত্যসত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বর্তমান কালে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় সেইগুরু জীবনই অত্যাবশ্যক, যিনি নিজের জীবন দ্বারা ছাত্রদের মধ্যে জীবনের সঞ্চার করবেন , জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানের বাতি জ্বালাবেন, স্নেহের দ্বারা কল্যাণ সাধন করবেন। এক্ষেত্রে আমাদের জীবনের লক্ষ্যকে ঠিক করে নিতে হবে, আমাদের দেশের শিক্ষাকে আমরা কোন পথে সত্য আকার দান করতে পারব। আমাদের স্মৃতিতে এখনো অত্যুজ্জ্বল হয়ে আছে ভারতের তপোভূমি, সাধকের সাধন কেন্দ্র, সাধুর কর্মস্থান, সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে ইউরোপের নানাপ্রকার বিদ্যাও। বিদ্যালাভ ও জ্ঞানলাভের এসব প্রণালির মধ্যে আমাদের সামঞ্জস্য স্থাপন করতে হবে। তা না হলে পরের অনুকরণ ও নকলের দ্বারা আমরা কেবল বাহিরের ঠাট বজায় রেখে ভিতরের দিকে অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ব। এক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে শিক্ষার প্রদান বাহন করে তুলতে হবে, কোনো বিজাতীয় ভাষা দ্বারা স্বদেশ ও সমাজ উপযোগী প্রকৃত শিক্ষাদান করা সম্ভব নয়। ভাষাশিক্ষার সঙ্গে ভাবের শিক্ষাও প্রদান করতে হবে, তা না হলে সে শিক্ষাও জীবন অসংলগ্ন হয়ে পড়বে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, কোনো বহিরাগত নিয়ম, বিধি বা প্রণালি নয় ভারতবর্ষের ইতিহাস, সমাজ, পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য করে শিক্ষাদান করতে হবে। যেখানে নিভৃতে তপস্যা হয়, যেখানে গোপনে ত্যাগ এবং সাধন করে শক্তিলাভ করা যায়, যেখানে অধ্যাপকেরা জ্ঞানচর্চায় প্রবৃত্ত সেখানে ছাত্ররা সম্পূর্ণভাবে শিক্ষাকে প্রত্যক্ষ করে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনার সম্পর্কে হুমায়ুন আজাদ বলেছেন :

> কোনো মৌলিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তা করেন নি। জীবনের বিভিন্ন সময়ে তাঁকে স্বদেশের শিক্ষা, শিক্ষার তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে ভাবতে হয়েছে। তাঁর শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলী সে-ভাবনারই ফল। এগুলোতে তাঁর হৃদয়ের উপলব্ধি, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও দেশের প্রয়োজন বড়ো হয়ে উঠেছে। তিনি সর্বাঙ্গীণ মানুষ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, তিনি যে শিক্ষাধারা কামনা করেছেন, তা সেই পরিপূর্ণ মানুষের জন্যে। (আজাদ, ১৯৭৩ : ১২৭)

একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সংস্কৃতির সুষ্ঠু বিকাশ নির্ভর করে সেই দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ওপর। শিক্ষা এ ক্ষেত্রে সংস্কৃতির দুহিতা। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার একটি অন্যতম আদর্শ ও লক্ষ্য হচ্ছে সুষ্ঠু সংস্কৃতির দ্বারা মানবসভ্যতা ও এর উন্নয়ন এবং অগ্রগতি। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনায় শিক্ষা-সংস্কৃতির যোগ ঘটানো প্রসঙ্গে আবুল মোমেন বলেছেন :

CamScanner

> রবীন্দ্র শিক্ষা-চিন্তার প্রধান অবদান এই যে এ শিক্ষায় বিদ্যার্থী জ্ঞানের সাথে সাথে একটি বিকাশমান সংস্কৃতির ধারায় যুক্ত হয়। এই বিকাশমান সংস্কৃতি বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিরোধ স্পৃহা ও শক্তির মুখাপেক্ষী না হয়ে তখনই জাতীয় পর্যায়ে পরিব্যাপ্ত হতে পারবে যখন দেশের রাজনীতি ও সংস্কৃতি হবে অন্যের নির্ভর।... এর জন্যে চাই যথোপযুক্ত শিক্ষা, যে শিক্ষারই রূপরেখা তৈরি করেছেন রবীন্দ্রনাথ। অর্থাৎ তাঁর গানসহ সাংস্কৃতিক বৈভব নিয়ে যে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক লড়াই চলছে তাঁর শিক্ষাচিন্তার রূপায়নও তারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। (মোমেন, ১৯৮৭ : ৬৮-৬৯)

রবীন্দ্র প্রবর্তিত শিক্ষাভাবনার যথার্থ প্রয়োগের অভাবে ভারতবর্ষের তথা আমাদের দেশেও বিকৃত চিন্তা, সংস্কৃতি ও ভাষার চর্চা পুরোদমে এগিয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে প্রকৃত শিক্ষক এবং সৃজনী ক্ষমতাসম্পন্ন লোকের অভাব থাকার কারণে শিক্ষার কাজ চলছে সাদা-কালোর বিভেদজ্ঞানহীন চর্মচক্ষুবেষ্টিত একদল দোকানি মাস্টার দ্বারা। আর এই দোকানি মাস্টারাই পরিক্রমা থেকে পরিক্রমায় জায়গা করে নিচ্ছেন শিক্ষাদানের নিচ থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত। তাইতো পাঠশালার ছেলেমেয়েরা আজও বেত সহযোগে মাস্টারমশাই দেখে ভয়ে শিহরিত হয়ে বুঝে না বুঝে পাঠ মুখস্থ করে এবং পরীক্ষার খাতায় পেট খালি বমি করে। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাদানের এরূপ প্রণালিকে কখনো সমর্থন জানান নি। তাই সর্বশক্তি দিয়ে তাঁর সমস্ত রচনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গোটা বিশ্বের কাছে তাঁর প্রবর্তিত স্বতন্ত্র শিক্ষাচিন্তার রূপরেখা তুলে ধরেছেন। সৃষ্টিশীল, উদার, আধুনিক স্বাজাত্যবোধসম্পন্ন শিক্ষামণ্ডলী, প্রকৃতির আতিথ্যে লালিত বিদ্যালয় এবং রাজনৈতিক-সামাজিক বর্হিচাপ মুক্ত পরিবেশ, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান নয়, শিক্ষাদানের জন্য যথার্থ মানুষ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের নির্মাণ প্রভৃতি অবকাঠামোর ওপর রবীন্দ্র-প্রবর্তিত শিক্ষাচিন্তার সাফল্য নির্ভর করবে বলে আমরা মনে করি।

তথ্যনির্দেশ

আজাদ , হুমায়ুন (২০০৪) । রবীন্দ্রপ্রবন্ধ রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা । ঢাকা : আগামী প্রকাশনী ;

আহমদ , সফিউদ্দিন (১৯৯৯) । রবীন্দ্রনাথের ভাষা সাহিত্য ও শিক্ষাচিন্তা । ঢাকা : বিশ্ব সাহিত্য ভবন ;

ঠাকুর , রবীন্দ্রনাথ (২০০০) । 'শিক্ষার হেরফের' । প্রবন্ধসমগ্র । ঢাকা : সময় ;

ঠাকুর , রবীন্দ্রনাথ (২০০০) । 'শিক্ষা সমস্যা' । প্রবন্ধসমগ্র । ঢাকা : সময় ;

ঠাকুর , রবীন্দ্রনাথ (১৯৯৫) । 'শিক্ষার বাহন' । রবীন্দ্র রচনাবলী ১৮ খণ্ড । । বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ ;

মুরশিদ , খান সারওয়ার (১৯৯৫) । 'প্রধান অতিথির ভাষণ' । শিক্ষাবার্তা । সম্পাদনা : আফরোজেন নাহার রাশেদা ;

মোমেন , আবুল (১৯৮৭) । 'আমাদের সংকট ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা' । নানা রবীন্দ্রনাথের মালা । সম্পাদনা : আবুল হাসনাত : ঢাকা : বাংলা একাডেমি ;

রায় , অজয় (১৯৯৫) । 'আলোচনা' । শিক্ষাবার্তা । সম্পাদনা : আফরোজেন নাহার রাশেদা । ঢাকা ।

CamScanner

Dulali Rani Saha*

Santiniketan Versus Conventional and Didactic Schooling

Abstract - *There is a paramount importance of school education on the lives of individuals. Schooling transforms the personal qualities of individuals. Research shows that only high quality delivery can develop a child into a complete and whole human being. The transition into the school age years co-inside with a shift from an ego- centric way of thinking. Majority of Children get their education from traditional schools in any country. Conventional school system is not very different from the modern school system. In didactic method of teaching, the teacher gives instructions to the students and the students are mostly passive listeners. It is a teacher-centered and content oriented method of teaching. Sometimes, didactic instruction for young children may harm their intellectual, social, and emotional developments. One of the problems of modern school system is that they withdraw children from society and inculcate them with values and knowledge that make it difficult for them to return to their society. Due to over-industrialization of education, Rabindranath Tagore founded a school at Santiniketan of India. He clearly felt that what is needed is not any particular material object, not wealth or comfort or power, but awakening to full consciousness in soul freedom and the freedom of the life in God. Tagore created a form of authentic education that he believed to be true to the need of children growing up in rural India than conventional or didactic schooling.*

Keywords : Rabindranath Tagore, Education, Schooling, Shantiniketan.

*Assistant Professor, Department of Education, Uttara University, Dhaka, Bangladesh

CamScanner

Introduction

Education is the culmination of facts, experiences, and thoughts. Schooling is a formal process generally associated with the institution of education. Education and schooling go hand in hand. Many people view these terms of education and schooling as same but there is a difference between these two. French philosopher Foucault states that the power elite in the classical age discovered the body as both "an object and target of power" and therefore sought to use state institutions, one of them being schools, to produce "docile bodies" that could be "subjected, used, transformed, and improved" (p. 136). In Discipline and Punish (1979), Foucault drew analogies between the creation of the prison and the social organization of the school system in the 18th century (Source: Justin Saldana 2013). Sometimes schooling can stand as a barrier to children's teaching, growing in wisdom and understanding, becoming educated in knowledge and virtue. Despite the long history of didactic triad— teaching, learning and content—there is a need for further analytical framework that shall integrate the three elements in the triangle and explore the relationship among them. This takes a brief look on traditional schooling at that time and which greatly influenced the idea of the unique school of Santiniketan.

Conventional Schooling

Conventional and didactic teachings are used to teach required theoretical knowledge. The teacher is the source of knowledge and the Knowledge is transmitted to the student through this method. It is content oriented and the students are mostly passive listeners. It does not satisfy the needs and interests of all students. It is a monologue process and experience of the students does not have a significant role in learning. In conventional schooling system child's life is subjected to the education factory, lifeless, colorless and dissociated from the context of the universe. It is devastatingly accurate assessment of what is going on. For industrialization to work, it needs uniformity. This is essential in industrialization so the bolts fit in with the next stage in the process. Any bolt outside that range is a

CamScanner

`defect' and be discarded or reworked to make it fit. So too in education, when same minimum test score is set as an acceptable level of progress. Any student falling below that level is considered a defect and a failure of the schooling process.

Tagore wrote a biting satire on conventional schooling called The Parrot's Tale. This showed how a parrot was to be 'educated'. It was locked in a cage, denied food and water and had theories written on paper rammed down its throat. He wrote: "But for us to maintain the self-respect which we owe to ourselves and to our creator, we must make the purpose of education nothing short of the highest purpose of man, the fullest growth and freedom of soul."

History of School Education

More complex civilization rose in the river valleys of Egypt and Babylonia. It was difficult to transmit knowledge directly from "person to person and from generation to generation". The school appeared as a place where reading, writing and learning can take place. Memorization was the method of learning and it was motivated by a fear of severe punishment. In Ancient Greece, city-states greatly varied in nature and it was true for the education as well. In Sparta, soldier-citizen was the focus of education. But the basic focus of education in Athens, was to produce citizens trained in the arts of both peace and war.

Ancient Roman education put emphasis on the effective speaker as good citizen. The Roman Republic became an empire, in 31 BC. Then the emperor was more powerful than the orator, thus the school lost their practical value. In the early Middle Ages, the elaborate Roman school systems disappeared. In Western Europe, the Clergy operated Cathedral, monastic, and Palace schools. The Renaissance, which began in the 14th century in Italy and spread to Northern Europe in the 15th and 16th century, revolted against the Middle Ages schooling system. Renaissance wanted intellectual, spiritual, and physical powers to enrich life as was done in Greece.

CamScanner

According to The History of Education-Edited by: Robert Guisepi : In the 17th century philosophers, too, were beginning to develop theories of learning that reflected the new scientific reliance on firsthand observation. John (Johann) Amos Comenius (1592-1670), his own observations of children led him to the conclusion that they were not miniature adults. He characterized the schools, which treated them as if they were, as "the slaughterhouses of minds" and "places where minds are fed on words." Rousseau developed the idea of student-centered learning. He believed that the child is innately good but that all social institutions, including schools, are evil, distorting the child into their own image. Rousseau's observations and their educational ramifications were a complete reversal of the educational theories and practices of the 1700s. … Rousseau, however, believed that the child differs from the adult in the quality of his mind, which successively unfolds in different stages of growth. "We are always looking for the man in the child," he said, "without thinking what he is before he becomes a man."

19th Century Europe and United States, the German educator Froebel (1782-1852) wanted his school to be a garden where children unfolded as naturally as flowers. Like Pestalozzi, he felt that natural development took place through self-activity, activity springing from and sustained by the interests of the child himself. The kindergarten provided the free environment in which such self-activity could take place….For Johann Friedrich Herbart (1776-1841),…education must be based on psychological knowledge of the child so that he could be instructed effectively (Source: The History of Education- Edited By: Robert Guisepi).

There is a touch of mysticism in Tagore's philosophy of education. But his mysticism is healthier than that of Froebel's who limited it only to childhood. Tagore brought their mysticism to the level of realities of life and included in it all the stages of education. It is in this respect he was ahead of Pestalozzi experience, that is, elementary and pre-elementary stages of educative experience. Tagore was a naturalist but his naturalism was not a narrow one.

CamScanner

According to The History of Education-Edited by: Robert Guisepi : In the 17th century philosophers, too, were beginning to develop theories of learning that reflected the new scientific reliance on firsthand observation. John (Johann) Amos Comenius (1592-1670), his own observations of children led him to the conclusion that they were not miniature adults. He characterized the schools, which treated them as if they were, as "the slaughterhouses of minds" and "places where minds are fed on words." Rousseau developed the idea of student-centered learning. He believed that the child is innately good but that all social institutions, including schools, are evil, distorting the child into their own image. Rousseau's observations and their educational ramifications were a complete reversal of the educational theories and practices of the 1700s. … Rousseau, however, believed that the child differs from the adult in the quality of his mind, which successively unfolds in different stages of growth. "We are always looking for the man in the child," he said, "without thinking what he is before he becomes a man."

19th Century Europe and United States, the German educator Froebel (1782-1852) wanted his school to be a garden where children unfolded as naturally as flowers. Like Pestalozzi, he felt that natural development took place through self-activity, activity springing from and sustained by the interests of the child himself. The kindergarten provided the free environment in which such self-activity could take place….For Johann Friedrich Herbart (1776-1841),…education must be based on psychological knowledge of the child so that he could be instructed effectively (Source: The History of Education- Edited By: Robert Guisepi).

There is a touch of mysticism in Tagore's philosophy of education. But his mysticism is healthier than that of Froebel's who limited it only to childhood. Tagore brought their mysticism to the level of realities of life and included in it all the stages of education. It is in this respect he was ahead of Pestalozzi experience, that is, elementary and pre-elementary stages of educative experience. Tagore was a naturalist but his naturalism was not a narrow one.

CamScanner

It was a sort of means to spiritualism which he wanted to develop among the boys (Source: Dreamsea Das 2014). He felt that man and nature have an original integration and hence he based his philosophy of life and education on this concept (Source: Sreeparna Bhattacharjee 2014).

Practical Aspects of Tagore's Theory

Tagore did not write a central educational treatise, and his ideas gleaned through his various writings and educational experiments at Santiniketan....the roots of his intellectual creativism and emotional make-up lie in the Upanishads...the religious atmosphere of the Brahmo Samaj (Source: Dreamsea Das 2014).

Tagore's educational theory was put into practice in his school at Santiniketan. Santiniketan founded by Rabindranath Tagore in 1901 and located about a hundred and fifty eight kilometers northwest of Kolkata in Bengal's rural hinterland, which represents the distillation of Rabindranath Tagore's life, philosophy and greatest works through his lifetime and the continuing legacy of his unique model of education and internationalism through a living institution and architectural ensemble. He said, "The character of good education is that it does not overpower man; it emancipates him" (Tagore, 1351 B.S., p.62 as quoted in Radha Vinod Jalan Dissertation)

Tagore tried to present a wider choice of subject matter and activities to his students and by doing so he intended to present an integrated education — education as an expression of intellectual abilities, aesthetic abilities and most of all an education which was related to life also...Schedule at Santiniketan was drastically different than what Tagore had experienced in his child- hood and that was one of the reasons he tried to create an atmosphere in his school, here freedom flourished, creativity got a special recognition and students as well as teachers together participated in the process of learning (Source: Radha Vinod Jalan, Dissertation).

CamScanner

Hirendrenath Datta describes his philosophy as Concrete Monism. It is monism because reality is conceived as one, and it is concrete because the one reality is not an abstract principle negating completely the reality of the many, but is a concrete whole, comprehending the many within its bosom....He tried to give India an educational system which can meet the spiritual and natural needs of human beings....This idea of Rabindranath gave birth to "Santiniketan" (abode of peace) an Ashrama style educational institution in which he provided education based on the principle of freedom, natural trust, co-operation and joy (Source: Dutta, Hirendranath 1941).

Rabindranath's educational philosophy was not a system in the prevalent sense of the term system. A system formulated by modern day pedagogies with rules and regulations and ready-made method in which teachers are taught how to teach particular subjects and prepare lessons and text books within set paradigms. According to Anderson, "The greatest opportunity for learning in the Open System... is found in infancy and the pre-school years when there are few environmental demands, no curriculum and little systematic teaching. It is at this period of no curriculum and little pressure that the greatest and most rapid learning takes place and that creativity is most universally manifest. The Open System permits originality, experimentation, initiative and invention; it constitutes the propitious environment for creativity" (Anderson, 1961 as quoted in Radha Vinod Jalan, Dissertation). While criticizing the revealing curriculum in the schools of India, Tagore mentioned its unrealistic nature, non-congruency, too many books and very little or no creativity, no imagination. In his school, he tried to get rid of these problems.

Tagore really had no fixed curriculum in mind. His emphasis on ideals of life and his aim — his institution's aim — to achieve them made the curriculum of the school a unique curriculum. He believed in the flexible and dynamic character of curriculum and relied on the ideals that inspired its adoption. Hirendranath Datta wrote, "It was to be borne in mind that there was nothing extra- curricular in Gurudeva's scheme of education. He had no curriculum of studies as such. He had, instead, a curriculum of life. The emphasis all the time was on learning to live rather than on living to learn" (Datta, 1957, p. 38).

CamScanner

Tagore's Perspective of Education and Schooling

Tagore never wrote down his complete philosophy of education. He provided glimpses. "My School" (1916) is the first and perhaps the most comprehensive writing by Tagore on his school at Santiniketan. In a lecture he gave in America called `My School' he said – "The young mind should be saturated with the idea that it has been born in a human world which is in harmony with the world around it. And this is what our regular type of school ignores with an air of superior wisdom, severe and disdainful. It forcibly snatches away children from a world full of the mystery of God's own handiwork, full of the suggestiveness of personality. It is a mere method of discipline which refuses to take into account the individual" (Source: Internet).

He also mentioned in his lecture, "It is a manufactory specially designed for grinding out uniform results. It follows an imaginary straight line of the average in digging its channel of education….So my mind had to accept the tight-fitting encasement of the school which, being like the shoes of a mandarin woman, pinched and bruised my nature on all sides and at every movement….The cause of it is this, that man's intention is going against God's intention as to how children should grow into knowledge….The highest education is that which does not merely give us information but makes our life in harmony with all existence. But we find that this education of sympathy is not only systematically ignored in schools, but it is severely repressed" (Source: Internet).

Tagore had different views of education. 'Siksar Herpher' is Tagore's very first writing which enunciates explicitly some of his fundamental educational thoughts… eloquently pleads for a system of education conducted in congenial surroundings and in a manner surcharged with the spirit of joy. It argues that the ultimate aim of education should be the all-round development of an individual for harmonious adjustment to reality….'Siksar Herpher' was considered the first really comprehensive and competent criticism of the educational system of the country at that time (Source: Ravi Singh and Sohan Singh Rawat 2013).

CamScanner

In the article 'Purvaprasner-Anubritti', he argued, "it is necessary to remember that if we place education in the hands of the government, they will attempt through that education to fulfill their own interests and not ours. They will so arrange that a farmer may remain only a farmer in his village; they will not bother to make him a true citizen of India. We can impart education according to our desire only if we take education in our hands. It is absurd both to beg and to order" (Rabindra Rachanavali, V.XII, p. 516 as quoted in Ravi Singh and Sohan Singh Rawat 2013).

First important writing in this direction is "Tapovan"(Jan,1910)—Forest. In this article for the first time, Tagore introduced a new idea of the education of feeling (Bodher sadhana) and he distinguished it from the education of the senses and the education of the intellect. This education of feeling consists of the realization of man's bond of union with the universe through the spirit, through the soul, through the deeper intuition of feeling (Source: Ravi Singh and Sohan Singh Rawat 2013).

The book Russia-r-Chithi (May, 1931) —Letters from Russia, possesses considerable value as a forceful exposition of some of the most fundamental aspects of Tagore's socio-political philosophy and the objects that impressed Tagore from educational points of view….He criticized their uniform pattern of educational product, sacrificing individual needs and interests for the collectives (Source: Ravi Singh and Sohan Singh Rawat 2013).

Conclusion

School gives heterogeneous society commonness and this was the purpose of the school from the beginning. The school is connected to the society. There are evidences that examination results tend to be better where non-didactic teaching methods are used. The rationale for avoiding didacticism appears entirely reasonable. Tagore's views on every aspect of personal and the social life have profound impact even after century. His success lies in the fact that he did not try to control directly the ideas, feelings and values of the children but imaginatively designed an environment and a program of activities

CamScanner

and experiences that invites the desired response. There must be an adequate provision to selfless activities, co-operation, love, fellow feeling, and sharing among the students in educational institutions. Perhaps, time has come to re-think for further improvement as the world-wide unrest damages the changes.

References

[1] Anderson, H. H. Creativity and education. College and University Bulletin. May, 1961

[2] Datta, H. Lest we forget. Visva-Bharati News, Silver Jubilee Number 1957

[3] Dreamsea Das, Educational Philosophy of Rabindranath Tagore. Impact: International Journal of Research in Humanities, Arts and Literature (Impact: Ijrhal), Vol. 2, Issue 6, Jun 2014, 1-4

[4] Dutta, Hirendranath., "Rabindranath as a Vedantist", Visva Bharati Quaterly, May-Oct 1941.

[5] Foucault, Michel .(1979). Discipline and punish : the birth of the prison. Publisher: New York : Vintage Books.

[6] http://history-world.org/history of education.htm, The History of Education- Edited By: Robert Guisepi

[7] Internet-http://www.gyanpedia.in/Portals/0/Toys%20 from%20Trash/Resources/books/readings/03.pdf

[8] Justin Saldana, Power and Conformity in Today's Schools Justin Saldana. International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 3, No. 1, January 2013, pg.229

[9] Mrs. Sreeparna Bhattacharjee , Relevance of Tagore's philosophy of education in postmodern era- a conceptual analysis. IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) , Volume 19, Issue 9, Ver. IX (Sep. 2014), PP 34-40 , www.iosrjournals.org www.iosrjour nals.org 34 | Page

[10] Radha Vinod Jalan ,Tagore — His Educational Theory And Practice And Its Impact On Indian Education. A Dissertation Presented To The Graduate Council of The University Of Florida

[11] Ravi Singh and Sohan Singh Rawat, Rabindranath Tagore's Contribu tion In Education. VSRD International Journal of Technical & Non-Technical Research, Vol. IV, Issue VIII, August 2013, PP 203-204

[12] Tagore, R. Siksa. Calcutta: Visva-Bharati, 1351 B. S.

CamScanner

Forkan Ali*

Idea of Global Village and Rabindranath : Tagore's Internationalization of Education

Abstract - *Ranbindranath Tagore is one among the very first educators in order to assuming when it comes to the idea of actual Global Village. Rabindranath Tagore's ideas of method of trainings, knowledge designs and instructional models include a unique sensitivity with awareness. These also offer aptness with regard to training amongst multi-racial, multi-lingual as well as multi-cultural points. These also show problems associated with recognized economic difference as well as political discrepancy. Thus, the aim of this paper is to explore the contribution of Rabindranath Tagore in education in terms of internationalization of learning and gaining knowledge. Through the approach of the idea of 'Global Village' its endeavors come with surprising findings that Tagore's philosophy of education is located without any institutional confinement and its significance was wider but not limited to literature, arts, music, dance and sciences.*

Keywords : Rabindranath Tagore, Global Village, Internationalization of Education, Multiculturalism.

1. Introduction

1.1 Background of Tagore

Rabindranath Tagore (1861-1941) is the Asia's first Nobel Laureate. He was born in an outstanding Calcutta family proverbial for its socio-religious and cultural innovations throughout the nineteenth Bengali Renaissance. The philosophically and profoundly social and cultural involvement of his family would later play a powerful role within the formulation of Rabindranath's educational priorities and preferences.

*Lecturer, Department of English, Jhenaidah Govt. Veterinary College, Jhenaidah,Bangladesh

CamScanner

His grandfather Dwarkanath was concerned in supporting medical facilities, educational establishments and therefore the arts, and he fought for religious and social reform and therefore the institution of a free press. Moreover, his father was a frontrunner in social and religious reform He inspired a multi-cultural exchange within the family mansion Jorasanko. In this joint family, thirteen brothers and sisters of Rabindranath were mathematicians, journalists, novelists, musicians, artists. His cousins shared the family mansion, were leaders in theatre, science and a brand new social movement.

1.2 Reflections

The incredible excitement and cultural prosperity of his extended family permitted young Rabindranath to understand and learn subconsciously at his own pace. It has provided him a dynamic and vibrant 'open model of education'. Later, he tried to restructure and remake this in his school at Santiniketan. Not astoundingly, he got his outside formal schooling to be inferior and boring that did not satisfy his quest and, following a short revelation to several schools. He could not gain interest and refused to attend school. It's been seen that the only degrees he ever received were honorary ones bestowed late in life.

His experiences and understandings at Jorasanko gave him with a lifelong sincerity and confidence regarding the significance of freedom in education. He also understood and realized in a thoughtful manner the significance of the arts for developing empathy and sensitivity, and the inevitability for a cherished and close relationship with man's cultural and natural environment. In taking part in the sophisticated, international and cosmopolitan activities of the family, he came to rebuff and refuse narrowness and restriction in general, and in particular, any form of restriction and narrowness that alienated and divided human being from human being. He understood and looked at education as a vehicle or a way for appreciating the richest as well as brighter aspects of other cultures, while upholding one's own cultural specificity.

CamScanner

His grandfather Dwarkanath was concerned in supporting medical facilities, educational establishments and therefore the arts, and he fought for religious and social reform and therefore the institution of a free press. Moreover, his father was a frontrunner in social and religious reform He inspired a multi-cultural exchange within the family mansion Jorasanko. In this joint family, thirteen brothers and sisters of Rabindranath were mathematicians, journalists, novelists, musicians, artists. His cousins shared the family mansion, were leaders in theatre, science and a brand new social movement.

1.2 Reflections

The incredible excitement and cultural prosperity of his extended family permitted young Rabindranath to understand and learn subconsciously at his own pace. It has provided him a dynamic and vibrant 'open model of education'. Later, he tried to restructure and remake this in his school at Santiniketan. Not astoundingly, he got his outside formal schooling to be inferior and boring that did not satisfy his quest and, following a short revelation to several schools. He could not gain interest and refused to attend school. It's been seen that the only degrees he ever received were honorary ones bestowed late in life.

His experiences and understandings at Jorasanko gave him with a lifelong sincerity and confidence regarding the significance of freedom in education. He also understood and realized in a thoughtful manner the significance of the arts for developing empathy and sensitivity, and the inevitability for a cherished and close relationship with man's cultural and natural environment. In taking part in the sophisticated, international and cosmopolitan activities of the family, he came to rebuff and refuse narrowness and restriction in general, and in particular, any form of restriction and narrowness that alienated and divided human being from human being. He understood and looked at education as a vehicle or a way for appreciating the richest as well as brighter aspects of other cultures, while upholding one's own cultural specificity.

CamScanner

As he wrote in **"Ideals of Education"**

> *"I was brought up in an atmosphere of aspiration, aspiration for the expansion of the human spirit. We in our home sought freedom of power in our language, freedom of imagination in our literature, freedom of soul in our religious creeds and that of mind in our social environment. Such an opportunity has given me confidence in the power of education which is one with life and only which can give us real freedom, the highest that is claimed for man, his freedom of moral communion in the human world.... I try to assert in my words and works that education has its only meaning and object in freedom–freedom from ignorance about the laws of the universe, and freedom from passion and prejudice in our communication with the human world. In my institution I have attempted to create an atmosphere of naturalness in our relationship with strangers, and the spirit of hospitality which is the first virtue in men that made civilization possible.*
>
> *I invited thinkers and scholars from foreign lands to let our boys know how easy it is to realise our common fellowship, when we deal with those who are great, and that it is the puny who with their petty vanities set up barriers between man and man." (Rabindranath Tagore 1929: 73-74)*

Grown and brought up in a family that was the center of meeting place for leading artists and intellectuals from India and the West, Rabindranath Tagore got a further opportunity to get an experience which was remarkable for someone of his upbringing. Then, he was given in responsibilities of the family's rural properties in East Bengal. However, his initial try with adult education were carried out there as he steadily became conscious of the delicate and sensitive material and cultural poverty that saturated the villages, and the enormous divide between the uneducated rural areas and the city elites. These experiences of him made him strong-minded to do something about rural strengthen, and afterward at Santiniketan, students and teachers were concerned with literacy training and social work and the endorsement of cooperative schemes.

Thus, as a substitute to the accessible forms of education, he initiated a small school at Santiniketan in 1901 that urbanized into a university and rural renovation and rebuilding centre, where he attempted to enlarge a substitute model of education that branched out from his own learning experiences.

CamScanner

1.3 Tagore's Works

Rabindranath Tagore wrote his very first verse at age eight, and by the end of his life, had composed over twenty-five volumes of poetry. He also had written fifteen plays, ninety short stories, eleven novels, thirteen volumes of essays, instituted, crafted and edited various journals, organized and made Bengali textbooks, hold up communication materials, massages and correspondence connecting thousands of letters. He beautifully composed over two thousand songs; and – after the age of seventy – created more than two thousand pictures and sketches. He devoted forty years of his life to his educational institution at Santiniketan, West Bengal. Rabindranath's school possesses a children's school and a university known as Visva-Bharati and a rural education Centre known as Sriniketan.

2. Key ideas and Approach

2.1 Idea of Global Village

"Global village" is a phrase closely connected with Canadian-born Marshall McLuhan. In his books, The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man (1962) and Understanding Media (1964) he made this term popular. McLuhan explained how the globe has been constricted into a village by technological development and the immediate movement of information from one place to another at the same time.

It is to depict the occurrence of the world's culture decreasing and increasing at the same time due to invasive technological advances that let for immediate distribution of culture (Johnson 192). The declaration is that it is likely for all the cultures of the world to become one global village. This idea or sense of global village highlights the significance of an empathetic and compassionate sense of nterconnectedness with the surrounding world. This is the idea which informally initiated by Rabindranath through his works, writings and experiences that the universal education brings the whole world at one place.

CamScanner

¡2.2 Brief discussion of literature on the Ideas of Tagore

It is seen that Rabindranath Tagore did not compose a central educational treatise, and his ideas must be garnered and collected through his variety of writings and educational experiments at Santiniketan. Generally, he visualized an education that was profoundly embedded in one's instant surroundings but connected to the cultures of the extended world, logical learning and individualized to the traits of the child. He experienced and understood that a curriculum should rotate organically just about nature with classes happened in the open air beneath the trees to offer for a natural admiration of the flexibility of the plant and animal kingdoms, and seasonal changes.

Thus, children took their seats on hand-woven mats under the trees, which they were permitted to climb and run beneath between classes. Consequently, nature walks and excursions were an element of the curriculum and students were motivated to pursue the life cycles of insects, birds and plants. Moreover, class schedules were found to be flexible to permit for shifts in the weather or special concentration to natural phenomena and incidents, and seasonal celebrations were created for the children by Tagore.

Thus, children took their seats on hand-woven mats under the trees, which they were permitted to climb and run beneath between classes. Consequently, nature walks and excursions were an element of the curriculum and students were motivated to pursue the life cycles of insects, birds and plants. Moreover, class schedules were found to be flexible to permit for shifts in the weather or special concentration to natural phenomena and incidents, and seasonal celebrations were created for the children by Tagore.

In the essay "A Poet's School," Tagore highlights the significance of an empathetic and compassionate sense of interconnectedness with the surrounding world :

CamScanner

> We have come to this world to accept it, not merely to know it. We may become powerful by knowledge, but we attain fullness by sympathy. The highest education is that which does not merely give us information but makes our life in harmony with all existence. But we find that this education of sympathy is not only systematically ignored in schools, but it is severely repressed. From our very childhood habits are formed and knowledge is imparted in such a manner that our life is weaned away from nature and our mind and the world are set in opposition from the beginning of our days. Thus the greatest of educations for which we came prepared is neglected, and we are made to lose our world to find a bagful of information instead. We rob the child of his earth to teach him geography, of language to teach him grammar. His hunger is for the Epic, but he is supplied with chronicles of facts and dates…Child-nature protests against such calamity with all its power of suffering, subdued at last into silence by punishment. (Rabindranath Tagore, Personality, 1917: 116-17)

In his philosophy of education, the aesthetic expansion and growth of the senses was as significant as the intellectual–if not more so. Moreover, music, literature, art, dance and drama were given immense eminence in the daily life of the school. This was chiefly so following the starting decade of the school. Relating to his home life at Jorasanko, Rabindranath attempted to generate an atmosphere in which the arts would become innate and natural. One of the initial fields to be emphasized was music. Tagore writes that in his youth, a "cascade of musical emotion" flooded forth day after day at Jorasanko. "We felt we would try to test everything," he writes, "and no achievement seemed impossible…We wrote, we sang, we acted, we poured ourselves out on every side." (Rabindranath Tagore, My Reminiscences 1917: 141)

He always kept a strong relation with his theory of subconscious learning. Rabindranath Tagore never discussed or wrote down to the students, but somewhat implicated them with whatsoever he was composing. However, the students had entrée to the place where he read his new writings to teachers and critics, and they were motivated to read out their own writings in particular literary evenings. To talk about teaching also he believed and understood in presenting complex levels of literature, which the students might not completely grab, but which would arouse them.

CamScanner

Composing and publishing of periodicals had always been a significant feature of Jorasanko life, and students at Santiniketan were motivated to generate their own publications and put out a number of demonstrated magazines. The children were motivated to pursue their ideas in painting and drawing and to receive stimulation and encouragement from the many visiting artists and writers. Particularly talking about dramas, Most of Tagore's plays were written at Santiniketan and the students participated in both the performing and production sides. He discusses how well the students were talented to get into the force of the plays and perform their roles, which needs delicate understanding and empathy without particular training.

As Tagore started envisaging of Visva-Bharati as a national centre for the arts, he motivated artists such as Nandalal Bose to stay at Santiniketan and to dedicate them full-time to endorsing a national form of art. Tagore exclusively wrote, without music and the fine arts, a nation cannot gain its highest means of national self-expression and the people stay inarticulate and mumbling. In line with this, Tagore was one of the first to maintain and convey together diverse forms of Indian dance. He assisted revitalize folk dances and initiated dance forms from other parts of India, such as Manipuri, Kathak and Kathakali. He, in addition, patronized modern dance and was one of the first to be familiar with the gifts of Uday Sankar, who was encouraged to present his talents at Santiniketan.

The convergence and meeting place of cultures, as Rabindranath imagined it at Visva-Bharati, should be a education centre where contradictory interests are diminished, where persons work together in a universal quest of truth and comprehends,

CamScanner

To give confidence and empathy, Rabindranath encouraged artists and scholars from other parts of India and the world to exist together at Santiniketan on a daily basis to distribute their cultures with Visva-Bharati If we see at the Constitution chosen for Visva-Bharati as an Indian, Eastern and Global cultural centre whose objectives were:

a. To learn and revise the mind of Man in its comprehension of diverse features of truth from varied points of view.
b. To convey more close relation with one another through tolerant study and research, the dissimilar cultures of the East on the basis of their essential unity and harmony.

c. To move toward the West from the point of view of such a harmony of the life and thought of Asia.

d. To look for to understand in a universal fellowship of reading and learning the meeting of East and West and therefore eventually to reinforce the basic conditions of world peace in the course of the free communication of ideas between the two hemispheres.

e. In addition to this, with such Ideals in view to offer at Santiniketan a centre of culture where research into the learning of the religion, literature, history, science and art of Hindu, Buddhist, Jain, Zoroastrian, Islamic, Sikh, Christian and more on other civilizations may be followed along with the culture of the West.

Along with that straightforwardness and candor of externals which is essential for true spiritual comprehension, in friendship, good-fellowship and assistance between the intellectuals, thinkers and scholars of both Eastern and Western countries, free from all antagonisms of race, nationality, dogma or caste and in the name of the One Supreme Being who is Shantam, Shivam, Advaitam.

In the consideration of syllabus and program, Tagore promoted a diverse importance in teaching. More willingly than revising national cultures for the wars won and cultural dominance forced, he sponsored a teaching system that examined history and culture for the development that had been completed in breaking down social and religious barriers. This exclusive approach highlighted the modernization and creativity that had been prepared in incorporating individuals

CamScanner

of miscellaneous backgrounds into a bigger structure and formation, and in developing the economic policies which highlighted social justice and lessened the gap between rich and poor. Connecting to this, art would be studied for its function in furthering the aesthetic imagination and articulating universal themes.

With the following, it should be celebrated that Rabindranath himself was a living emblem of the kind of mutuality, sympathy and creative exchange that he supported. His dream of culture was not a static one, but one that sponsored new cultural fusions, and he struggled for a world where manifold voices were motivated to relate with one another and to settle differences within a superseding commitment to peace and shared interconnectedness. Tagore's bighearted and kind personality and his determination to break down blockades of all sorts provides us a model for the way multiculturalism can survive and found within a single human personality, and the sort of individual which the educational progression and procedure should be hopeful and confident towards.

More significantly Tagore's educational labors were innovative in many areas. He was one of the first in India to fight for a humane educational system that was in contact with the environment and intended at overall development of the personality. Thus, Santiniketan became a representation for vernacular instruction and the expansion of Bengali textbooks; additionally, it opened one of the initial coeducational programs in South Asia. The founding of Visva-Bharati and Sriniketan showed the path towards ground-breaking efforts in many directions, counting models for characteristically Indian higher education and mass education, plus pan-Asian and global cultural exchange.

Moreover, another feature that sets Tagore's educational theory apart is his advance to education as a poet. He avowed, at Santiniketan, his objective was to generate a poem 'in a medium other than words.' Originally, it was this poetic visualization that facilitates him to trend a scheme of education which was all comprehensive, and to formulate a distinctive program for education in nature and uniquely creative self-expression in a study climate amiable and pleasant to global cultural exchange.

CamScanner

3. Conclusions

By his hard works, efforts and achievements, Rabindranath Tagore, is component of a global network of ground-breaking educators, such as Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Montessori and Dewey. He is in the modern-day context, Malcolm Knowles–who have endeavored to generate non-authoritarian education systems suitable to their particular surroundings. Thus this paper recommends and opens for further elaboration on the deep inspection to look at the philosophy of education of Tagore. It also premises that free and internalization of education can me patronized for a better outcome.

I would like to conclude with a poem that articulates and fashions Tagore's goals for internationalization of education. He writes:

Where the mind is without fear
and the head is held high,
Where knowledge is free;
Where the world has not been broken
up into fragments by narrow domestic
walls;
Where words come out from the
depth of truth;
Where tireless striving
stretches its arms towards
perfection;
Where the clear stream of reason
has not lost its way into the
dreary desert sand of dead habit;
Where the mind is led forward
by thee into ever-widening
thought and action–
into that heaven of freedom,
my Father,
Let my country awake.

CamScanner

4. References

1. Dutta, Krishna & Andrew Robinson. (1995). Rabindranath Tagore: The Myriad-Minded Man, London: Bloomsbury.
2. Kripalani, Krishna. (1980). Rabindranath Tagore, Calcutta: Visva-Bharati.
3. Legrain, Phillipe. "In Defense of Globalization: Why Cultural Exchange Is Still an Overwhelming Force for Good Globalization. " Johnson 209-14.
4. O'Connell, Kathleen. (2002). Rabindranath Tagore: The Poet as Educator, Calcutta: Visva-Bharati.
5. Selected letters of Rabindranath Tagore. (1997). edited by Krishna Dutta and Andrew Robinson.
6. Tagore, Rabindranath. (1980). Our Universe. Translated by Indu Dutt. Bombay: Jaico Publishing House
7. Tagore, Rabindranath. (1961). The Religion of Man. Boston: Beacon Press.
8. Tagore, Rabindranath. (1985). Rabindranath Tagore:Selected Poems. Translated by William Radice. Harmondsworth, Middle sex: Penguin Books.
9. Tagore, Rabindranath. (1966). A Tagore Reader. Edited by Amiya Chakravarty. Boston: Beacon Press.
10. Tagore Rabindranath. (1922). Creative Unity. London: Macmillan & Co.
11. Tagore, Rabindranath. (1961). Towards Universal Man. New York: Asia Publishing House. Tagore, Rabindranath.(1917). My Reminiscences. New York: The Macmillan Company.
12. Tagore, Rabindranath. (1917). Personality. London: Macmillan & Co.
13. Tagore, Rabindranath. (1929. "Ideals of Education", The Visva-Bharati Quarterly (April-July),73-4

CamScanner

লেখকদের জন্য জ্ঞাতব্য

'লেখনী' : ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক উত্তরা ইউনিভার্সিটির বাংলা বিভাগের একটি জর্নাল। এতে প্রকাশের জন্য বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য, বাংলা সংস্কৃতি এবং বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণামূলক লেখা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক, 'লেখনী', বাংলা বিভাগ, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (ইমেইল: lekhani@uttarauniversity.edu.bd এই ঠিকানায় লেখা পাঠাতে হবে। গবেষকদের নির্ধারিত নিয়ম মেনে প্রবন্ধ জমা দিতে হবে।

নিয়মসমূহ নিম্নরূপ :

১. পাণ্ডুলিপির দুই কপি কম্পিউটার কম্পোজ করে সিডিসহ বা পেনড্রাইভ জমা দিতে হবে।
২. প্রবন্ধে লেখকের পেশাগত পরিচয়, ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বরসহ লেখক পরিচিতি ২৫০ শব্দের মধ্যে থাকবে।
৩. কাগজের সাইজ হবে A4।
৪. জমাকৃত প্রবন্ধের লেখক তিনি/তাঁরা:
   এটি একটি মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ;
   প্রবন্ধটি ইত:পূর্বে অন্য কোনো পত্রিকা বা গ্রন্থে প্রকাশ হয় নি কিংবা প্রকাশের জন্য অন্য কোথাও জমা দেওয়া হয় নি;
   এই প্রবন্ধ বিষয়ক সকল দায়িত্ব লেখক বহন করবেন।
৫. প্রকাশের জন্য মনোনীত কিংবা অমনোনীত কোনো পাণ্ডুলিপি ফেরত দেওয়া হয় না।
৬. প্রবন্ধ বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে অথবা বাংলা-বানান অভিধান ও ব্যবহারিক বাংলা অভিধান প্রভৃতি অভিধান অনুযায়ী রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।
৭. উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের পরিবর্তন হবে না। লেখক কোনো বিশেষ বানান-বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সচেষ্ট হলে তা অক্ষুণ্ন রাখা হবে। তথ্যনির্দেশ ও টীকার জন্য শব্দের ওপর অধিলিপিতে (Super Script) সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে (যেমন : [১])।
৮. তথ্যনির্দেশে লেখক বা লেখকগণের পূর্ণ নাম থাকবে। বই ও পত্রিকার উৎস দেখানোর সময় অনুসরণীয় নীতি হলো; প্রকাশিত বই : উদয় কুমার চক্রবর্তী, বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ (কলকাতা : শ্রী অরবিন্দ পাবলিকেশন, ১৯৯৮ পৃ. ৪০)
৯. মূল পাঠের মধ্যে উদ্ধৃতি তিন লাইনের বেশি হলে পৃথক অনুচ্ছেদে তা উপস্থাপন করতে হবে। কবিতার উদ্ধৃতিতে মূলের পঙ্‌ক্তি-বিন্যাস থাকবে।
১০. মূল পাঠে অপরিচিত বিদেশি শব্দ থাকলে বাংলা লিপিতে প্রতিবর্ণীকরণের (transcription) নিয়ম অনুযায়ী লিখতে হবে। ব্যক্তি ও বইয়ের নাম প্রথম বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজিতে লিখতে হবে।
১১. গ্রন্থের একাধিক লেখক থাকলে তথ্যনির্দেশে সকলের নাম উল্লেখ করতে হবে।
১২. কবিতার-গল্প-প্রবন্ধের নামে ডাবল উর্ধ্বকমা (""), গ্রন্থের নাম 'ইটালিকস' করতে হবে।
১৩. প্রবন্ধের শেষে টীকা (যদি থাকে) এবং টীকার পরে তথ্যনির্দেশ সংযোজিত হবে। প্রত্যেক ভাষার গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পৃথকভাবে উপস্থাপিত হবে এবং এ উপস্থাপন রীতি হবে সাল অথবা বর্ণানুক্রমিক।
১৪. প্রবন্ধের একটি সারসংক্ষেপ অবশ্যই দিতে হবে। উৎস/তথ্যসূত্রে APA রীতি অনুসরণ করতে হবে।
১৫. পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করতে হবে।
১৬. উদ্ধৃতিতে 'পূর্বোক্ত' ব্যবহার করতে হবে, 'প্রাগুক্ত' বা 'ঐ'-এর ব্যবহার চলবে না।

CamScanner